সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

# কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ

## সুচিত্রা ভট্টাচার্য

শিবালিক পর্বতমালা ধরে ছুটছিল গাড়িখানা। গাছগাছালিতে ছাওয়া সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে। চক্রাকার রাস্তা কখনও চড়াই তো কখনও উতরাই। পথের কিনারে গভীর খাদ এই যদি বাঁয়ে তো এই ডাইনে। ভয়ংকর ওই সব খাদের পানে তাকালে গা শিরশির করে, মাথা ঘুরে যায়। টুপুরের অবশ্য চক্কর-টক্কর লাগে না। তা ছাড়া আনন্দে সে এখন রীতিমতো ডগমগ।

পুজোর ছুটিটা যা জমে উঠেছে এবার! জব্বর একখানা চমক দিল বটে পার্থমেসো। আগে কিচ্ছুটি জানায়নি, হঠাৎ সপ্তমীর সকালে ট্রেনের টিকিট নিয়ে হাজির। শুধু টুপুর নয়, টুপুরের মা-বাবাকেও যেতে হবে। দশমীর সন্ধেয় দিল্লি-কালকা মেলে যাত্রা শুরু, তারপর ক'টা দিন হিমাচল প্রদেশে চরকি খেয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরে ব্যাক। টুপুরের তো পোয়াবারো। কলকাতার দুর্গাপুজোটাও মিস হল না, আলটপকা একটা ভ্রমণও জুটে গেল কপালে। তাও হেঁজিপেঁজি বেড়ানো নয়, কুলু, মানালি, রোটাং! টুপুরের স্বপ্নের দেশ।

আজ কাকভোরে ট্রেন থেকে নেমেছে টুপুররা চণ্ডীগড়ে। সেখানেই ভাড়া করা হল এই সাত আসনের গাড়ি এবং তৎক্ষণাৎ রওনা। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ পেরিয়ে পঞ্জাবের রোপারে ব্রেকফাস্ট, তারপর দুপুর-দুপুর মান্ডি পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজ। এবার তাদের গন্তব্য কুলু।

গাড়ির একদম পিছনের সিটে মিতিন আর বুমবুম। পথশ্রমে বুমবুম বেশ ক্লান্ত, মায়ের কোলে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমোচ্ছে সে। মাঝের আসনে টুপুর, সহেলি আর অবনী। পার্থ বসেছে ড্রাইভারের পাশে, হাতে হিমাচল প্রদেশের একখানা প্রকাণ্ড ম্যাপ। তীক্ষ্ণ চোখে কাগজখানা দেখছে পার্থ, আর হঠাৎ-হঠাৎ চোখ তুলে তাকাচ্ছে ইতিউতি। যেন মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে পথঘাট!

ম্যাপখানা মুড়ে পার্থ আচমকা চালকের পানে ঘাড় ঘোরাল, "ভাইসাব, অভি তক হম কিতনা কিলোমিটার আয়া?"

চালকটি এক তরুণ শিখ। নাম টিঙ্কু সিংহ। তারস্বরে পঞ্জাবি গান চালিয়েছে টিঙ্কু। গান না বাজালে পাহাড়ি রাস্তায় তার নাকি চোখ বুজে আসে। স্পিকারের আওয়াজ সামান্য কমিয়ে টিঙ্কু বলল, "চণ্ডীগড়সে মান্ডি দোসো কিলোমিটার। উসকে উপর তিস-চাল্লিস জোড় লিজিয়ে।"

"তার মানে কুলু এখনও পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার। পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

সহেলি খানিক ঝিমোচ্ছিলেন। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বললেন, "এই সেরেছে। তার মানে অন্ধকারের মধ্যে পৌঁছব? একটা অচেনা, অজানা জায়গায়?"

"তো? জঙ্গলে গিয়ে পড়ছি নাকি? এত বিখ্যাত একটা টুরিস্ট প্লেস! হিমালয়ের একটা প্রধান গেটও বলা যায়।"

"কিন্তু গিয়ে হোটেল খুঁজতে হবে যে। আমাদের তো কোনও বুকিং-টুকিং নেই!"

"ওটা কোনও সমস্যা নাকি?" অবনী এবার ঢাউস বই থেকে মুখ তুলেছেন। নিশ্চিন্ত সুরে বললেন, "তোমার গ্রেট সিস্টার আছে না টিমে? প্লাস, এমন ওস্তাদ ভগ্নিপতি পার্থ?"

"বাহ্-বাহ্, সব দায় বুঝি ওদের, অ্যাঁ? তুমি খালি বসে-বসে ঠ্যাং নাচাবে আর থান ইট গিলবে?"

অভিযোগটা একশো ভাগ সত্যি। পরশু সন্ধেয় ট্রেনে চড়ার পর থেকে কুটোটি নাড়েননি অবনী। মালপত্র তোলা-নামানো, রাতে শোওয়ার বন্দোবস্ত, খাওয়ার জোগাড়, চণ্ডীগড়ে নেমে গাড়ির জন্য ছোটাছুটি, সমস্ত ঝক্কি মিতিন আর পার্থ পালা করে সামলেছে। এদিকে অবনী বইই পড়ে চলেছেন একটানা। সম্প্রতি সমুদ্র সম্পর্কে বেজায় আগ্রহ জেগেছে অবনীর, তাই তিন-তিনখানা ওশিয়ানোগ্রাফির বই নিয়ে চলেছেন পাহাড়ে। টুপুরের বাবার এ হেন বিদঘুটে খেয়ালে টুপুরের মা তো বিরক্ত হতেই পারেন।

অবনী অবশ্য গ্রাহ্যেই আনলেন না সহেলিকে। হাই মাইনাস পাওয়ার চশমাখানা ঠিক করতে-করতে বললেন, "আরে বাবা, ওরা অল্পবয়সি, ওসব কাজ তো ওদেরই মানায়। তার উপর মিতিন হল গিয়ে ডিটেকটিভ। সুপারস্মার্ট লেডি। পার্থও যথেষ্ট চালাকচতুর বিজনেসম্যান। আমার মতো আজীবন ছাত্র ঠেঙানো এক সাধারণ কলেজ মাস্টারের সঙ্গে ওদের তুলনা হয় নাকি?"

সহেলি রেগে টং। তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "তোমার কায়দাবাজির কথা রাখো। সাফ বলে দিচ্ছি, কুলুতে কিন্তু মিতিন-পার্থ মোটেই গাড়ি থেকে নামবে না। তুমি একা গিয়ে একটা ভাল হোটেলের ব্যবস্থা করবে।"

"রাতটা তা হলে গাড়িতেই কাটবে রে দিদি," মিতিন মুচকি হেসে ফোড়ন কাটল, "তারপর ভোর হলে আমাদেরই বেরোতে হবে অবনীদাকে খুঁজতে।"

পার্থ হা-হা হেসে উঠল। টুপুরও হাসছে মিটিমিটি। চোয়াল শক্ত রেখেও নিজেকে সামলাতে পারলেন না সহেলি, হেসে ফেলেছেন ফিক করে। ব্যস, অবনীকে আর পায় কে! ফের তিনি বইয়ের পাতায় মনোযোগী।

অপাঙ্গে তাঁকে একবার দেখে নিয়ে পার্থ বলল, "এবার জায়গা বুঝে কোথাও একটু দাঁড়ালে হয় না?"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"স্ন্যাক্স ব্রেক। এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া কিংবা চপ।"

"তুমি এখন খেতে পারবে? দুপুরে না দশ-এগারোখানা রুটি সাঁটালে?"

"সর্বনাশ, তুই গুনছিলি নাকি?" পার্থ হ্যা-হ্যা হাসল, "এমন চমৎকার পাহাড়ি জায়গা! নির্মল বাতাস, নো পলিউশন, যা খাচ্ছি তুরন্ত হজম। পেট ফের হাঁক পাড়ছে রে।"

"পেট ছাড়া আরও অঙ্গ আছে মশাই," মিতিন কুটুস হুল ফোটাল, "চোখ দু'টোকেও একটু ইউজ করো। সিনসিনারিগুলো দ্যাখো।"

"দেখার এখন আছেটা কী? মান্ডির পর সেই যে শুরু হল, শুধু পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। দু' ঘণ্টা ধরে তো পাহাড়ই গুনে যাচ্ছি। তাও যদি একখানা আইস-পিক চোখে পড়ত!"

"সঙ্গে-সঙ্গে যে বিপাশা নদীটা চলেছে, সেটা নজরে পড়ছে না?"

"বিপাশা তো এখন সারাক্ষণ পাশে-পাশে থাকবে ম্যাডাম। কুলু-মানালি ছাড়িয়ে সেই রোটাং পাস পর্যন্ত। কতবার যে ওর সঙ্গে মোলাকাত হবে!"

"বেশ তো। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে যে লেকটা পড়ল, সেটাও তোমার মনে ধরল না?"

"উহ্ল নদীর পান্ডো-ড্যাম?" পার্থর উদাসী জবাব, "মন্দ নয়, তবে কুলু হল গিয়ে ভ্যালি অফ গড্স। দেবদেবীদের উপত্যকায় আমি আরও সুন্দর কিছু এক্সপেক্ট করি।"

"মিলবে-মিলবে," মিতিন আশ্বাস দিল, "পৌঁছে দ্যাখো।"

কথোপকথনের মাঝেই সূর্য ঢাকা পড়েছে এক পাহাড়ের আড়ালে। মাথার উপর ঝকঝক করছে আকাশ, তবু আলো যেন মরে এল সহসা। দ্রুত ছায়া ঘনাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে, দূরে-দূরে, দেখা যায় ছোট-ছোট গ্রাম। আলোছায়া মাখা চাষের খেতগুলোও যে এখন কী অপরূপ!

টুপুর একদৃষ্টে বাইরেটা দেখছিল। অস্ফুটে বলে উঠল, "বিউটিফুল। ঠিক যেন পটে আঁকা ছবি!"

পার্থ ফের ম্যাপে ডুবেছে। জিজ্ঞেস করল, "কী রে?"


MODY INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE (MITS)
(Deemed University u/s 3 of the U.G.C. Act, 1956)

ADMISSIONS 2011-12 ....ONLY FOR GIRLS

LAKSHMANGARH-332311, Distt. Sikar (Rajasthan) Ph: ( 01573) 225001 (12 Lines) Extn. (223/210/401) Fax: (01573) 225044
E-mail: dean.fasc@mitsuniversity.ac.in / Visit us at: www.mitsuniversity.ac.in

FACULTY OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE

B.B.A. / B.Com (Hons.)
B.Sc. (Hons.) Biotechnology
B.Sc. (Chem., Zoo., Biotech)
B.A. (Hons.) Economics
B.A. (Hons.) English
B.A. (Hons.) Psychology

B.A. (Hons.) French
B.A. (Hons.) Vedic Astrology
B.A. (English, Political Sc., Sociology, Garment Production & Export Mgt. Any three).
B.C.A. (Maths not Required)
Eligibility: A Pass in 10+2

M.Sc. (Chemistry)
M.Sc. (Biotechnology)
M.Sc. (Microbiology)
M.Sc. (Information Technology) (Maths not required)
Eligibility: Minimum 50% in graduation

Application form can be downloaded from www.fascmits.ac.in.
Application forms (with prospectus) are also available at the designated branches of Oriental Bank of Commerce (OBC). For details of branches, refer to the website.

Last date of Admission: 24th July 2011
Admission desk:
09950000974 / 09887780960 / 09414664006 / 01573-225879

ATUL

One Foreign Language compulsory for all Programmes (Chinese, French, German, Japanese, Spanish) On Campus, Regular CA/ CPT/ CAT/ MAT coaching available by professionals

"একবার চোখটা ঘোরাও না। দৃশ্যগুলো মনে হচ্ছে, কেউ যেন তুলি দিয়ে এঁকেছে।"

"ন্যাচারাল বিউটি তো আছেই রে। নইলে এখানকার মানুষরা এমনি-এমনি জন্ম-আর্টিস্ট হয়!" পার্থ বিজ্ঞ স্বরে বলল, "জানিস নিশ্চয়ই, কুলু উপত্যকায় পেন্টিংয়ের একটা নিজস্ব ধারা আছে। লোকাল শিল্পীরা এক-একজন তো রীতিমতো তুখোড়। এমন-এমন ছবি আঁকে, সাহেবরা পর্যন্ত ভিরমি খেয়ে যায়। কত বিদেশি টুরিস্ট যে এখান থেকে ছবি কিনে নিয়ে যায়!"

সহেলি নড়েচড়ে বসলেন, "আমরাও দু'-একটা কিনতে পারি। ড্রয়িংরুমে একটাও ভাল পেন্টিং নেই, যদি পছন্দসই কিছু পাওয়া যায়।"

"নো প্রবলেম। এখন তো কুলুতে বিখ্যাত দশেরার মেলা চলছে, ওখান থেকেই বেছেবুছে নিতে পারবেন।"

"বিখ্যাত কেন বলছ? খুব বড় মেলা নাকি?"

"অতি বৃহৎ। ভারতে যে ক'টি আন্তর্জাতিক মেলা বসে, তার মধ্যে কুলুর দশেরার মেলা অন্যতম। দেখবেন, কী এলাহি আয়োজন!"

সত্যি, কুলুতে পৌঁছে চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। পাহাড়ে ঘেরা শহরখানা আলোয়-আলোয় ঝলমল করছে। বড় রাস্তার গায়েই সমতলে বিশাল এক মাঠ, সেখানেই বসেছে মেলা। গিজগিজ করছে মানুষ, মাইক বাজছে, লোকজনের হইহল্লায় চতুর্দিক গমগম।

রাস্তার একধারে গাড়ি লাগিয়েছে টিঙ্কু। জানলার কাচ নামিয়ে পার্থ উল্লসিত স্বরে বলল, "ওয়াও! মেলা তো জমে ক্ষীর!"

টুপুর চকচকে চোখে বলল, "ঝপ করে এক পাক ঘুরে নিলে হয় না?"

"উঁহু, এখন কোথাও নয়। আগে হোটেল। পরশু বিকেল থেকে শুধু দৌড় চলছে, খানিক জিরিয়ে তবে ঘোরাঘুরি," বলেই সহেলি ঠেলছেন অবনীকে, "কী গো, এবার থাকার ব্যবস্থাটা করো।"

অবনী কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "আ-আ-আমি? এই ভিড়ে কোথায় যাব?"

পার্থ হেসে বলল, "আহা, থাক-থাক। অবনীদাকে রেহাই দিন। আমি দেখছি।"

তড়াক লাফিয়ে পার্থ রাস্তায়। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। মিতিন গলা বাড়িয়ে বলল, "মেলার মাঠটার নাম ঢালপুর ময়দান। এটাই কুলুর সেন্ট্রাল প্লেস। কাছেই গভর্নমেন্টের টুরিস্ট সেন্টার পাবে, আগে সেখানে খোঁজ নাও।"

হনহনিয়ে এগোল পার্থ। এদিকে বুমবুমের ঘুম ভেঙেছে, জেগেই তিনি একের পর-এক বায়না জুড়ছেন! চিপ্‌স চাই, কোল্ডড্রিংক খাবে। অদূরে মেলায় অতিকায় নাগরদোলা দৃশ্যমান, এক্ষুনি তাতে চড়বে বলে রীতিমতো ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দিল। মিতিন তাকে ধমকে-ধামকে থামাচ্ছিল, পার্থ ফিরে এসেছে। হাত উলটে বলল, "নো চান্‌স। সরকারি সমস্ত লজ ভর্তি।"

"তা হলে কী হবে?"

"ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ঢালপুর ময়দানের আশপাশে অসংখ্য হোটেল, একটা না-একটাতে ঠিক ঢুকে যাব। আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গা ফিট করে ফেলছি।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আমি যাব?"

"নো নিড। পার্থ মুখার্জি এই কেসে একাই কাফি।"

মেসো চলে যাওয়ার পর টুপুর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। নেমেছে বুমবুমকে নিয়ে মিতিনও। দোকান থেকে মিতিন চা এনে দিল দিদি-জামাইবাবুকে। টুপুর আর বুমবুমকে চিপ্‌সের প্যাকেট। টিঙ্কুকেও চা খেতে ডাকল মিতিন। গেলাস হাতে গল্প জুড়েছে দু'জনে।

টুপুরের অল্প-অল্প শীত করছিল। গায়ে কার্ডিগান চাপানো, তবুও। হাত দু'টো সামনে জড়ো করে টুপুর দেখছিল মেলাটাকে। স্থানীয় মানুষদের গায়ে কী রং-বেরঙের পোশাক! ছেলেদের মাথায় রঙিন টুপি, মেয়েরা সেজেছে রুপোর গয়নায়। ওই টুপিগুলো নিশ্চয়ই কুলু টুপি? দেশি-বিদেশি পর্যটকরাও টুপি পরে ঘুরছে। মেলায় এসে ছেলেমানুষ বনে গেছেন বড়রাও, অনেকেই ভেঁপু বাজাচ্ছেন। এমনকী, সাহেব-মেমরাও। বিচিত্র বাজনা বাজাতে-বাজাতে একদল পাহাড়ি মেয়ে-পুরুষ পাক খাচ্ছে মেলাটাকে। কেউ-কেউ নাচ জুড়েছে। সবাই মিলে গানও গাইছে কী একটা। কচিকাঁচাদের উল্লাসের অন্ত নেই, তারাও চলেছে পিছু-পিছু।

জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কতক্ষণ কেটেছে কে জানে, হঠাৎই হন্তদন্ত পায়ে পার্থর আবির্ভাব। গোমড়া মুখে বলল, "ব্যাড নিউজ। ভেরি ব্যাড নিউজ। কোথাও ঠাঁই নেই। সব ক'টা হোটেল উপচে পড়ছে।" সমাচার শুনে সহেলির মুখ পাংশু। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ট্রেনে কতবার বললাম, হোটেল বুকিং না করে বেরনোটা মোটেই উচিত হয়নি।"

"প্যানিক করিস না তো দিদি। পার্থর এলেম বোঝা গেল, এবার আমি একটু চেষ্টা করি?" মিতিন গাড়ির দরজা খুলে ধরল, "এসো-এসো, উঠে পড়ো সকলে। জলদি-জলদি।"

পার্থ অবাক মুখে বলল, "কোথায় যাবে?"

"কোয়েশ্চেন পরে। চটপট বোসো তো সিটে।"

ফের চলা শুরু। মাঠ ছাড়িয়ে, শাঁ শাঁ আরও খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল গাড়ি। খাড়াই বেয়ে উঠছে ধীরে-ধীরে। এদিকটায় তেমন আলো-টালো নেই, বেশ অন্ধকার-অন্ধকার। সরু পথের দু' ধারে ঘরবাড়ি আছে বটে, তবে লোকজন দেখা যায় না বিশেষ। এক-আধজন যাও চোখে পড়ল, তাও সাদা চামড়ার। চড়াই বেয়ে উঠছে হেঁটে-হেঁটে।

টুপুর চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "এদিকেও হোটেল আছে নাকি? এত নির্জনে?"

মিতিনের নির্বিকার জবাব, "মনে হয় না।"

পার্থ অসহিষ্ণু স্বরে বলল, "তা হলে আমরা চলেছি কোথায়?"

"প্রাইভেট কটেজে।"

"মানে?"

"এখানকার অনেক স্থানীয় মানুষ টুরিস্টদের ঘর ভাড়া দেয়। আমাদের টিঙ্কু সিংহ এরকম তিন-চারটে কটেজের সন্ধান জানে।"

"তাই নাকি?"

"ইয়েস। এতক্ষণ তো টিঙ্কুর কাছ থেকে এসবই জানছিলাম। এখন দেখি কপাল ঠুকে।"

প্রথম বাড়িটায় বিফল মনোরথ হতে হল। দ্বিতীয়টাতেও। অবশেষে তৃতীয় একটি কাঠের বাড়ির দোতলায় দু'খানা ঘর মিলেছে। নীচে সপরিবার বাড়িওয়ালার বাস। খাবার-দাবার তারাই বানিয়ে দেবে। তবে দর অতি চড়া। অবনী বললেন, "রাতটুকু এখানেই ঘাঁটি গাড়া যাক, সকালে অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে।"

পার্থ-মিতিনেরও তাই মত। একমাত্র সহেলি যা একটু খুঁতখুঁত করছেন। মেলাটা এখান থেকে অনেকটা দূর হয়ে যাবে কিনা। অবশ্য শেষমেশ মেনেও নিলেন। এই কটেজ ছাড়া এখন আর গতি কী!

বাড়িওয়ালার নাম বিভব শর্মা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। কথাবার্তায় সজ্জন। নিজে দোতলায় উঠে খুলে দিলেন ঘর দু'টো। পার্থ আর টিঙ্কু মালপত্র নামাল গাড়ির ছাদ থেকে। সকলে মিলে ধরাধরি করে তুলল উপরে।

সুটকেস-টুটকেস ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পার্থ হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে সোফায়। অলস মেজাজে বলল, "এখন একটু কফি পেলে দারুণ হত।"

মিতিন বলল, "যা তো টুপুর, নীচে গিয়ে বলে আয়।"

টুপুর উঠতে গিয়েও থমকেছে। নীচ থেকে একটা গলার আওয়াজ আসছে না? কে যেন গাঁকগাঁক করে চেঁচাচ্ছে? বিভব শর্মা কী যেন বললেন অনুচ্চ স্বরে, পরক্ষণে চিৎকার আরও চড়ে গেল।

টুপুর সভয়ে বলল, "ঝগড়া বেধেছে নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" মিতিনের ভুরুতে হালকা ভাঁজ, "চল তো দেখি।"

মিতিনের পিছন-পিছন একতলায় নেমে আরও কুঁকড়ে গেল টুপুর। একটা রোগা, ঢ্যাঙামতো লোক চড়াও হয়েছেন বিভব শর্মার

ঘরে। বয়স বছর পঞ্চাশ। টিকলো নাক। বাবরি চুল। পরনে চুস্ত-পাঞ্জাবি, গায়ে কুলু শাল। সভ্যভব্য চেহারার মানুষটা আঙুল তুলে শাসাচ্ছেন বিভবকে। নরম গলায় তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে চলেছেন বিভব শর্মা। কিছুই শুনলেন না ভদ্রলোক, হঠাৎ দুদ্দাড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

মাথা নামিয়ে বসে আছেন বিভব শর্মা। হলটা কী?

॥ ২ ॥

কটেজের দু'খানা ঘরই ভাড়ার সঙ্গে মানানসই। ফায়ারপ্লেস, ইংলিশ খাট দিয়ে সাজানো দিব্যি আরামদায়ক কামরা। দরজা-জানলায় লম্বা-লম্বা পর্দা, মেঝেয় মোটা কার্পেট, এক সেট সোফা, কারুকাজ করা সেন্টারটেবিল, ওয়ার্ড্রোব, ড্রেসিংটেবিল, টিভি, শাওয়ার-গিজার-কমোড বসানো ঝকঝকে বাথরুম, সবই মজুত। এমনকী, লেখাপড়া করার চেয়ার-টেবিলও। সেখানে শোভা পাচ্ছে কম্পিউটার। বিদেশি পর্যটকদের মন কাড়ার জন্যই বুঝি এতসব বন্দোবস্ত। দেওয়ালে খান দুয়েক পেন্টিংও ঝুলছে। পাহাড়ের দৃশ্য, পাহাড়ি মানুষের মুখ, বিপাশা নদী। আঁকার মান নেহাত মন্দ নয়, তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে।

সারাদিন পর এমন একটা আস্তানা পেয়ে সকলেরই শরীর বেশ ছেড়ে গিয়েছে। কেউ আর বেরনোর নামটি করছে না। উষ্ণ-উষ্ণ জলে হাতমুখ ধুয়ে যে যার মতো তরতাজা হয়ে নিল খানিকটা। এখন সকলে মিলে জড়ো হয়েছে এক ঘরে। কফি আর গরম-গরম চিকেন পকোড়াও হাজির, হাত মুখ দু'ইই চলছে সমান তালে। বসেছে গল্পের আসর।

নীচের ঘটনাটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। যে ভদ্রলোক এসে চেঁচামেচি করছিলেন, তিনি নাকি একজন স্থানীয় শিল্পী। নাম বৈজনাথ রাই। এই কটেজেই নাকি দু'জন লোক এসে উঠেছিল, তারা তিনখানা ছবি আঁকতে দিয়েছিল বৈজনাথকে। আজ সকালে বৈজনাথের বাড়ি থেকে ছবি তিনটে নিয়েও এসেছে লোকগুলো। তখন নাকি বলেছিল, সন্ধেবেলা কটেজে এসে টাকা নিয়ে যেতে। এখন বৈজনাথ এসে দেখছেন, চিড়িয়া উধাও। মাঝখান থেকে বেচারার কড়কড়ে চল্লিশ হাজার টাকা চোট! এর পরেও বৈজনাথ ক্ষিপ্ত না হয়ে পারেন?

অবনী ভারী মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "ছি-ছি, শিল্পীকে কেউ এভাবে ঠকায়? লোকগুলো মহা পাজি তো!"

সহেলি বললেন, "ওরকম বদমাশ টুরিস্টও আসে তা হলে?"

"টুরিস্টদের মধ্যে সব ধরনের চিজই থাকে," পার্থ টুপুরের দিকে ফিরল, "লোকগুলো এ দেশি না ফরেনার?"

"খাঁটি ভারতীয়। মিস্টার শর্মা তো বললেন, দু'জনেই নাকি মুম্বইওয়ালা। পরিচয় দিয়েছিল বিজনেসম্যান।"

"চিটিংবাজির কারবার করে বোধ হয়। তা হোটেলে না উঠে এখানে আড্ডা গেড়েছিল যে বড়?"

"কে জানে! হয়তো আমাদের মতোই জায়গা না পেয়ে।"

"কবে এসেছিল?"

"বারো দিন নাকি ছিল এখানে।"

"মানে পুজোর আগে থেকে? স্ট্রেঞ্জ! তখন তো মেলাও শুরু হয়নি? বারো দিন ধরে টাউনের কোনও হোটেল না পাওয়াটা যেন কেমন-কেমন লাগছে!" পার্থ মিতিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, "কী গো, তোমার ইনটিউশন কী বলে?"

"ওদের হয়তো এরকম জায়গাই পছন্দ," মিতিন হাত উলটোল, "অনেকেই তো ভিড়ভাট্টা পছন্দ করে না। বেড়াতে এসে নির্জনতা খোঁজে।"

"মিটারও তো এখানে কম ওঠেনি! শুধু রুম-চার্জই দিয়েছে প্রায় লাখ খানেক!"

"দিয়েছে। তাদের খেয়াল।"

"তুমি কি এর মধ্যে কোনও রহস্য পাচ্ছ না?"

মিতিন হেসে ফেলল, "তুমি কি আমাকে খোঁচাচ্ছ?"

"নাহ্। জাস্ট তোমার ডিডাকশানটা বুঝতে চাইছি।"

"সরি। একটা মাত্র সমীকরণ থেকে এক্স-ওয়াই-জেডের সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।"

টুপুর বলল, "আমার কিন্তু মনটা খচখচ করছে, মিতিনমাসি। যারা লাখ টাকা শুধু ঘরভাড়াই দেয়, তারা বৈজনাথ রাইয়ের মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা মেরে দেবে?"

"এই প্রশ্নটায় দম আছে," মিতিন কফিতে শেষ চুমুক দিল, "তবে কী জানিস, মানুষ বড় আজব জীব রে। কোটি-কোটি টাকা যার রোজগার, অথচ সেও হয়তো কাজ করিয়ে লোককে পয়সা দেয় না। হায়দরাবাদের নিজামের কথাই ভাব। লাখ-লাখ টাকা খরচা করে পার্টি দিতেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষে এঁটো খাবারও ফেলে দেওয়ার জো ছিল না। তাঁর কর্মচারীদের ওসব গিলতে হত। অথচ তিনি তখন পৃথিবীর এক নম্বর বড়লোক। গ্যারাজে তাঁর লাইন দিয়ে রোল্‌স রয়েস।"

"বুঝেছি। তুমি ব্যাপারটাকে আমল দিচ্ছ না," পার্থকে কিঞ্চিৎ হতাশ দেখাল। পরক্ষণে সামান্য উজ্জীবিত স্বরে বলল, "আর একটা স্ট্রাইকিং পয়েন্ট আছে কিন্তু। তোমরাই বললে, বৈজনাথ রাই বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন। পাওনা আরও চল্লিশ। অর্থাৎ তিনটে ছবির জন্য মোট ষাট হাজার। লোকাল একজন আর্টিস্টের পক্ষে দামটা কি একটু বেশি ঠেকে না?"

"আমার মনে হয় না।"

"কেন জানতে পারি?"

"কারণ, বৈজনাথজির পেন্টিংয়ের হাত যথেষ্ট ভাল। ওই রকম একটা অ্যামাউন্ট উনি দাবি করতেই পারেন।"

"বৈজনাথজি কেমন আঁকেন, তুমি জানলে কী করে?"

"দেওয়ালের ছবিগুলো দেখে।"

"এগুলো বৈজনাথজির আঁকা নাকি?"

"ইয়েস স্যার। শুধু কান নয়, চোখ দু'টোও খোলা রাখো। ছবির কোনায় বৈজনাথ রাইয়ের দস্তখত আছে মশাই।"

পার্থ ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। টুপুরও হাঁ। ইস, মিতিনমাসির পর্যবেক্ষণশক্তিটা যে কেন এখনও টুপুর আয়ত্ত করতে পারল না?

চিকেন পকোড়া শেষ। সহেলি একটা হাই তুলে বললেন, "তোমাদের রহস্য খোঁজা এবার থামাও। একটু কাজের কথা হোক।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "যেমন?"

"এখানে যাব, ওখানে যাব, বললেই তো হবে না। আমাদের এগজ্যাক্ট টুর-প্ল্যানটা কী?"

"কালকের দিনটা আমরা কুলুতেই থাকছি। লোকাল যা-যা দ্রষ্টব্য তা তো দেখবই। খানতিনেক মন্দির আছে, তার মধ্যে বিজলেশ্বর মহাদেব টেম্পল তো যথেষ্ট ফেমাস। বিপাশার পারেও ঘুরব। তারপর বিকেল থেকে মেলা। আপনিও প্রাণ খুলে শপিং করতে পারবেন।"

"আমি কিন্তু জায়েন্ট হুইল চড়বই," বুমবুম প্রায় লাফিয়ে উঠেছে, "আর আমার একটা লাল-সবুজ টুপিও চাই।"

"হবে-হবে," হাত তুলে ছেলেকে আশ্বাস দিল পার্থ। ফের সহেলিকে বলল, "তারপর ধরুন, পরশু সকালে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। স্ট্রেট টু মানালি। সেখানে থ্রি নাইট হল্ট। একদিন তো রোটাং পাস যেতে আসতেই কেটে যাবে। একদিন চুটিয়ে মানালি সফর। হিড়িম্বার মন্দির, বশিষ্ঠ-আশ্রম, গোল্ডেন আপেলের বাগান, টিবেটিয়ান মনাস্ট্রি।"

পার্থ একটু সময় নিয়ে বলল, "এরপর যে প্ল্যানটা আছে, আমরা দু'ভাবে বাকি টুরটা সারতে পারি। রোটাং পেরিয়ে যেতে পারি কেলং। লাহুল-স্পিতির একমাত্র শহর। রুটটা একটু টাফ, তবে জায়গাটা নাকি দারুণ। ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্যিখানে ভ্যালি অফ গ্লেসিয়ার। মানে বুঝছেন তো? হাতের নাগালে বরফ। তা ছাড়া চন্দ্রভাগার ভাগা নদীটাকে ওখানে পেয়ে যাবেন।"

"কেলংয়ের নাম আর একটা কারণেও করা যায়," মিতিন বলে উঠল, "কলকাতায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা ছোড়ার অপরাধে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ধরা পড়েছিলেন ওই কেলংয়ে।"

"হ্যাঁ। ওখানে তাঁর একটা স্ট্যাচুও আছে বলে শুনেছি," পার্থ মাথা নাড়ল, "যাই হোক, কেলং একটা অপশন। দ্বিতীয় চয়েস, আমরা মানালি থেকে সিমলা চলে যেতে পারি। মোটামুটি আরও তিনটে দিন সিমলা আর তার চারপাশটা উপভোগ করে ট্রেনে ব্যাক টু কালকা। চণ্ডীগড়ের বদলে কালকা থেকেই নয় কলকাতা ফিরব।"

"মন্দ নয় আইডিয়াটা," সহেলি বললেন, "সিমলা-কালকা ট্রেনজার্নিটা নাকি খুব সুন্দর। একশো-দেড়শোখানা টানেল পড়ে পথে, সেটাও এক অভিজ্ঞতা।"

মিতিন ফুট কাটল, "প্লাস, তুই সিমলাতে প্রাণের সুখে শপিং করতে পারবি।"

অবনী হা-হা করে হেসে উঠলেন, "খাসা বলেছ। তোমার দিদি বাজার করা ছাড়া তো কিছু বোঝে না। ওর কাছে ভ্রমণ মানেই কাঁড়ি-কাঁড়ি জিনিস কেনা। আর ফিরে গিয়ে ডেকে-ডেকে সকলকে বিলোনো।"

"তোমার তাতে কী? তুমি চুপ করো তো। হাতে করে ছোটখাটো কিছু নিয়ে গেলে লোকে কত খুশি হয় জানো?"

"এখান-ওখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী আছে? কলকাতায় তো সবই পাওয়া যায়। চাইলে কুলুর পেন্টিংও।"

কর্তা-গিন্নিতে জোর তর্ক বেধেছে। তাঁদের থামাতে পার্থ তড়িঘড়ি বলে উঠল, "এক সেকেন্ড। এক সেকেন্ড। আমার একটা থার্ড প্ল্যানও আছে।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "যথা?"

"গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক। দুরন্ত জঙ্গল। সিমলা, কল্পা, কাজা, মানালি আর কুলুর ঠিক মধ্যিখানে। ওখানে প্রচুর ভাল-ভাল স্পট আছে। নানা ধরনের বন্যপ্রাণীরও দর্শন মিলবে।"

"ওরে বাবা, আমি ওসব জঙ্গল-টঙ্গলে নেই," সহেলি প্রতিবাদ করে উঠলেন, "মানালি থেকে সিমলার পরিকল্পনাটাই থাক।"

"আমি বলি কি," অবনী গলা ঝাড়লেন, "এত ছোটার কি কোনও প্রয়োজন আছে? কুলুতেই দু'-তিন দিন জিরোই, তারপর নয় মানালি ঘুরে বাড়ির পথে রওনা দেব। তিন-চার দিন না থাকলে কি কোনও জায়গা ঠিকঠাক চেনা যায়, তোমরাই বলো?"

"অ্যাই, তোমার আয়েশিপনা ছাড়ো তো। সকলের সঙ্গে যখন বেড়াতে বেরিয়েছ, তাল রেখে দৌড়তে হবে। ঘরে আরামসে বই নিয়ে বসে থাকবে, ওটি হচ্ছে না।"

"শুধু কি নিজের জন্য বলছি? বাচ্চাদের ধকলের কথা একবার ভাবো।"

"টুপুর আর মোটেই ছোট নেই। বুমবুমও তোমার মতো ইয়ে নয়, যথেষ্ট শক্তপোক্ত।"

আবার একচোট বিবাদ বাধার উপক্রম। সামাল দিতে ফের ঝাঁপিয়েছে পার্থ। প্রসঙ্গ বদলাতেই বুঝি রাতের মেনুর কথা পাড়ল। মিতিন পুটুস-পুটুস টিপ্পনি কাটছে। ঘরের পরিবেশ পলকে ঝরঝরে। সহেলি উঠে গেলেন পাশের ঘরে। নৈশাহার আসা পর্যন্ত খানিক গড়িয়ে নেবেন। অবনীও জাবদা বইখানা খুলেছেন। বুমবুম টিভি চালিয়ে দিল। রিমোট টিপে-টিপে ঠিক একটা কার্টুন চ্যানেল বার করে ফেলেছে। কলকাতায় হলে টুপুরও হয়তো পরদায় চোখ রাখত, কিন্তু হিমালয় ভ্রমণে এসে ইচ্ছে করছে না। পায়ে-পায়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। বাইরের সরু প্যাসেজটুকু জুড়ে টানা কাচের জানলা। বন্ধ জানলার কোনও এক ফাঁক দিয়ে হাওয়া আসছে ঠান্ডা-ঠান্ডা। আজ অক্টোবরের এগারো। অর্থাৎ এখনও আশ্বিন। আর মাসখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই এই কুলু উপত্যকা ঢেকে যাবে বরফে। ঢালপুর ময়দানখানা কেমন যে দেখাবে তখন?

ছবিটা কল্পনা করতে-করতে টুপুর কাচে চোখ রেখেছে। অদূরে আর একটা পাহাড়। অন্ধকারে পাহাড়টা নজরে পড়ার কথা নয়, তবে এমন বিন্দু-বিন্দু আলো ফুটে আছে গায়ে! নিশ্চয়ই বাড়িঘরের আলো। কিন্তু মনে হয় আকাশের তারাগুলো যেন নেমে এসেছে নীচে। নাকি আকাশটাই তারাদের নিয়ে!

"কী রে, কাচে নাক ঠেকিয়ে কী দেখছিস?"

টুপুর চমকে তাকাল। মিতিনমাসি।

হেসে টুপুর বলল, "সামনের পাহাড়টাকে গো। কী দুর্দান্ত লাগছে!"

"কুলু ভ্যালির তো এটাই বিশেষত্ব। যেদিকে তাকাবি, সেই দিকটাই বিউটিফুল। কোন-কোন হিমালয়ান রেঞ্জ কুলু ভ্যালিকে ঘিরে রেখেছে, ভাব। উত্তরে পীরপঞ্জাল, পুবে পার্বতী, পশ্চিমে বরাভাঙ্গাল আর দক্ষিণে ধৌলাধার। এদের মাঝখানে কুলু কার্পেটের মতো ছড়িয়ে আছে। একসময়ে এটা ছিল সেন্ট্রাল এশিয়ার গেটওয়ে। কুলু, মানালি, রোটাং, কেলং পেরিয়ে লাদাখ হয়ে ব্যবসায়ীর দল যাতায়াত করত নিয়মিত। এই পথের নাম ছিল গ্রেট ইন্ডিয়ান সিল্ক রুট।"

"এখন আর রাস্তাটা নেই?"

"ব্যবহার হয় না। আজকাল তো প্লেনেই লোকে যাতায়াত করে, খামোখা এত দুর্গম পথ কেন পাড়ি দেবে? একমাত্র ট্রেকিং যারা করে তারাই এখন..."

কথার মাঝেই হঠাৎ বুমবুমের উত্তেজিত ডাক, "মা, তাড়াতাড়ি এসো, দেখে যাও কী পেয়েছি!"

মিতিন-টুপুর দৌড়ল ঘরে। গিয়ে দেখল বুমবুম কম্পিউটারে বসে। তার হাতে একটি পেনড্রাইভ।

ভুরু কুঁচকে মিতিন বলল, "ওটা কোত্থেকে পেলি?"

"এই তো, টেবিলের ড্রয়ারে ছিল।"

পার্থ একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। উঠে এসেছে। বুমবুমের হাত থেকে পেনড্রাইভটা নিয়ে দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বলল, "আট জি বি মেমারি। নির্ঘাত আগের লোক দু'টো ফেলে গিয়েছে।"

"খুবই সম্ভব। হয়তো তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে, খেয়াল করেনি।"

"দেখব নাকি, কী আছে এতে?"

অবনী বই পড়া থামিয়ে পিটপিট তাকাচ্ছিলেন। বললেন, "অন্যের প্রাইভেট ডকুমেন্ট দেখা কি শোভন হবে? আমাদের উচিত বিভব শর্মার কাছে ওটা জমা করে দেওয়া।"

"রাখুন তো আপনার উচিত-অনুচিত। তারা কোন নীতিটা মেনেছে? যত সব ফোরটোয়েন্টি!" বলতে-বলতে বুমবুমকে হটিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল পার্থ। কম্পিউটার চালু করে পেনড্রাইভের কর্ড লাগাল জায়গা মতো। উৎসাহী গলায় বলল, "দেখা যাক, ব্যাটাদের কোনও গোপন তথ্য আবিষ্কার করা যায় কিনা!"

কম্পিউটার সচল হতেই পেনড্রাইভখানা লোড করে ফেলল পার্থ। মাউস টিপতেই বিস্ময়। ছবি, সার-সার ছবি। নিছক ফোটোগ্রাফ নয়, ক্যামেরাবন্দি একগুচ্ছ পেন্টিং, সবক'টারই বিষয়বস্তু পর্বত। সম্ভবত হিমালয় নিয়ে আঁকা। অনভিজ্ঞ চোখও বলতে পারে, কোনও দক্ষ শিল্পীর কাজ। একটি ছবিতেও রং চড়া নয়। নীল, বাদামি, লাল, সবুজ, সবই বেশ হাল্‌কা-হাল্‌কা। আলোছায়ার খেলাও আছে ছবিতে। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

অবনী বললেন, "এ তো কোনও বড় আর্টিস্টের এগজিবিশন থেকে তোলা ফোটো।"

"হুম্," মিতিন বিড়বিড় করল, "খুব পাওয়ারফুল ডিজিটাল ক্যামেরায় এবং সবক'টা ছবিই মনে হয় জলরঙে আঁকা।"

পার্থ বলল, "মোট সাঁইত্রিশটা আছে। তার মধ্যে তিনটেতে ক্রস মার্ক। কেন বলো তো?"

"হ্যাঁ। কেমন অদ্ভুত ঠেকছে," মিতিনকে যেন সামান্য চিন্তিত দেখাল, "বৈজনাথ রাইকে তিনখানা ছবি আঁকার অর্ডার দিয়েছিল না লোক দুটো?"

"তাই তো। ঠিকই তো," পার্থ ঢকঢক মাথা নাড়ল, "কিন্তু আঁকা ছবি কেন আবার আঁকতে বলবে? কপি করাচ্ছিল?"

"হতে পারে," অবনী বললেন, "অনেকে তো ভাল ছবির কপি দিয়েও ঘর সাজায়।"

"তাই কি?" মিতিন ঠোঁট টিপল, "ব্যাপারটা নিয়ে তো এবার

ভাবতে হচ্ছে।"

মিতিনমাসির এই স্বর ভীষণ চেনা। টুপুরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নির্ঘাত রহস্যের গন্ধ পেয়েছে মিতিনমাসি।

॥ ৩ ॥

মাত্র বিশ-তিরিশ ফিট নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা বিপাশা ঝুমঝুম শব্দ বাজিয়ে। এবড়োখেবড়ো ঢাল বেয়ে সেদিক পানে নামছিল টুপুর। সঙ্গে বুমবুম। মিতিন-পার্থও আসছে পিছন-পিছন। সতর্ক পায়ে। চার মূর্তিরই পোশাকে আজ ভারী মিল। পরনে জিন্‌স আর জ্যাকেট। পায়ে স্নিকার। সহেলি-অবনী উপরে দাঁড়িয়ে। দু'জনেই দেখছেন টুপুর-মিতিনদের অবতরণ।

সহেলি চেঁচিয়ে বললেন, "অ্যাই, সাবধানে-সাবধানে। নীচে শুধু পাথর! একটা হোঁচট খেলেই কেলেঙ্কারি ঘটবে।"

"কিছু হবে না মা," টুপুর গলা তুলে বলল। আরও নেমে একটা বড়সড় প্রস্তরখণ্ডের উপর ব্যালান্স করে দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে সন্তর্পণে ছুঁল বহতা ধারাকে। পলকে আঙুল সরিয়ে নিয়েছে। হাত ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, "উপ্‌স, কী ঠান্ডা!"

পার্থর কাঁধে ক্যামেরা। শাটার টিপছে পটাপট। নদীর গতিপথে ক্যামেরা তাক করে বলল, "হবে না? ডাইরেক্ট বরফগলা জল। রোটাংয়ের হিমবাহ থেকে রওনা দিয়ে কতটুকুই বা এসেছে!"

"কী স্বচ্ছ গো জলটা! কাচের মতন। তলার নুড়িপাথর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।"

"নদী যতক্ষণ পাহাড়ের কোলে, ততক্ষণ সে এরকমই। নোংরা তো হয় সমতলে গিয়ে।"

"তা বটে।"

নিজের মনে মাথা দোলাল টুপুর। সত্যি, পাহাড়ে বুঝি কোনও মালিন্যই টিকতে পারে না। নদীর জলে, নদীর পারে, কত ছোট-বড় পাথর, তারাও যেন চকচক করছে। সূর্য এখন পশ্চিম গগনে। তার নরম রোদ্দুর যেন পালিশ মারছে পাথরে। জলেও সোনালি আভা ঝিকমিক।

সকাল থেকে টুপুর যা দেখছে, সবই তো অপরূপ। ঘুম থেকে উঠে যেই না জানলার পরদা সরাল, অমনি সামনে সবুজ পাহাড়। পাইন আর দেবদারুতে ছাওয়া। নীচে শ্যামল উপত্যকা, মধ্যিখান দিয়ে বয়ে চলেছে রুপোলি আঁকাবাঁকা নদী। তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তারপর তো জলখাবার খেয়ে ন'টা নাগাদ বেরনো হল, তখন থেকে ডুবে আছে নিসর্গশোভায়। মেন রোডে গাড়ি থেকে নেমে তিন-চার কিলোমিটার হেঁটে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে গেল। ওই পথটাও কী সুন্দর! দু' পাশে পাহাড়ের গায়ে অজস্র নাম না-জানা ফুল, কত যে তাদের রঙের বাহার! বিজলেশ্বর মন্দিরে যাওয়াটাও বৃথা হয়নি। বিপাশা আর পার্বতী নদী যেখানে মিলেছে, সেই জায়গাটাও যে কী দারুণ লাগে উপর থেকে। বাড়তি জুটল মন্দিরের গল্পটা। প্রতি বছর নাকি বাজ পড়ে শিবলিঙ্গটি চুরমার হয়ে যায়। আর পুরোহিত নাকি ছাতুর সঙ্গে মাখন মিশিয়ে সেটিকে ফের জুড়ে দেন। ওই রাস্তাটা খানিক গোলমেলে ছিল। সঙ্গে টিঙ্কু সিংহ থাকায় অবশ্য তেমন অসুবিধে হয়নি। এই গোটা উপত্যকাটাই এমন হাতের তালুর মতো চেনে টিঙ্কুভাই।

সেই টিঙ্কুই এবার হাত নেড়ে-নেড়ে ডাকছে টুপুরদের। সহেলি বিকেল-বিকেল মেলায় ঘোরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবনীও বুঝি তাড়াতাড়ি মেলা দেখে কটেজে ফিরতে চান। ওশিয়ানোগ্রাফির বই বোধ হয় টানছে তাকে।

পার্থ-টুপুর কারওই কিন্তু এখন নদী ছেড়ে নড়ার ইচ্ছে নেই। দুপুরে পেট পুরে পরোটা-কাবাব খেয়েছে, এখন একটু পাথরে বসে রোদ পোহালে ভাল লাগবে। তবে সহেলি অধৈর্য হলে তো উপায় নেই। পায়ে-পায়ে সকলকে উপরে উঠতেই হয়।

গাড়িতে বসে বুমবুম একটা ছোট্ট পাথর বার করেছে পকেট থেকে। পার্থকে দেখিয়ে বলল, "একদম ফিশের মতো দেখতে না?"

পাথরটা নাড়াচাড়া করে পার্থ নাক চুলকে বলল, "জীবাশ্ম হতে পারে।"

"মানে?"

"মাছের ফসিল।"

টুপুর অবাক গলায় বলল, "কুলুতে মাছের ফসিল?"

"থাকতেই পারে। গোটা হিমালয়টাই তো এককালে সমুদ্রের তলায় ছিল। মাত্র কয়েকশো কোটি বছর আগে একটা স্থলভূমি যখন এসে এশিয়ায় জুড়ে যায়, তখনই ধাক্কার চোটে হিমালয় ঠেলে উঠেছে। অতএব সামুদ্রিক মাছের ফসিল হিমালয়ে পাওয়া কোনও আশ্চর্যের নয়।"

মিতিন অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। এতক্ষণে তার গলা বেজেছে, "কল্পনাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বোধ হয়।"

"কেন? হিমালয় তৈরি হওয়ার ইতিহাসটা কি ভুল?"

"না। তবে মাছের ফসিল-টসিল কুলুর মতো জায়গায় মিলবে না। সেগুলো পাওয়া যেতে পারে আরও অনেক উঁচুতে, বরফের রাজ্যে।"

পার্থ আমতা-আমতা করে বলল, "একটা-দু'টো পিস হয়তো নদীর স্রোতে চলে এসেছে।"

"জলে ভাসতে-ভাসতে? নাকি গড়াতে-গড়াতে?"

ব্যঙ্গটা শুনে গুম হয়ে গেল পার্থ। আর কথাটি বলছে না। গাড়ি ঢালপুর ময়দান পৌঁছে গিয়েছে। বেজার মুখে নামল সিট থেকে। একে-একে অন্যরাও। বুমবুম তো তিরবেগে ছুটেছে মেলার পানে, টুপুর ধাওয়া করল তাকে। সকালে অনেকটা হেঁটে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন সহেলি, সামনে দেদার দোকানপাট দেখে তাঁর হাঁটু-কোমরের ব্যথা উধাও, জ্বলজ্বলে মুখে কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মেলাখানা সত্যিই তারিফ করার মতো। হরেক জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছে পাহাড়ি মানুষরা। মুখোশ, টুপি, শাল, শাড়ি, সোয়েটার, জ্যাকেট আর গয়না তো আছেই, সঙ্গে হাতে বানানো আরও কতরকম যে সামগ্রী! বেশ কিছু তাঁবু পড়েছে মেলার মাঠে। একটি তো রীতিমতো জমকালো। মাথায় অনেক পতাকা উড়ছে। ওই তাঁবু নাকি কুলুর রাজার। এক জায়গায় সিমেন্টের গ্যালারিতে চলছে নাচাগানা। কোথাও নানান ঠাকুর-দেবতার মূর্তি।

টুপুর মূর্তিগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বুমবুমের হাত খামচে ধরে। একটা পিতলের প্রতিমা দেখিয়ে পার্থকে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কোন ঠাকুর গো মেসো?"

"সম্ভবত মানালির হিড়িম্বা টেম্পলের দেবী," পার্থর গোমড়া জবাব, "ঠিক বলছি কিনা তোর মাসির কাছে জেনে নে।"

মিতিন হেসে ফেলল, "না-না, ঠিকই বলছে। ওটা হিড়িম্বা মন্দিরের দুর্গা।"

"এখানে আনা হয়েছে কেন?"

"কুলুর দশেরা মেলায় এটাই তো রেওয়াজ," পার্থর জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাবটা ফিরে এসেছে। চোখ নাচিয়ে বলল, "গোটা উপত্যকার নানান গ্রাম থেকে এখানে দেবদেবীদের আনা হয় দশমীর দিন। টানা দশ দিন দেবদেবীরা এখানেই থাকেন।"

"দশেরায় রাবণবধ হয় না?"

"হয়। তবে দশমীতে নয়, মেলার শেষ দিন। স্টাইলটাও আলাদা রকম। রাবণের কোনও পুত্তলিকা পোড়ানো হয় না। তার বদলে রাবণের সিম্বল হিসেবে ঘাসের স্তূপে আগুন ধরানো হয় বিপাশার পারে। আর সেদিন বসে দেবতাদের দরবার। লোকাল লোকজন যে যার পছন্দমতো দেবতার কাছে মনস্কামনা জানায়। সেদিন নাকি মহা ধুমধাম..."

পার্থর বক্তৃতায় বাধা পড়ল। বুমবুম টানছে বাবাকে। এক্ষুনি তার নাগরদোলা চাই, ক্যান্ডিফ্লস চাই, রঙিন টুপি চাই।

মিতিন বলল, "তুমি যাও বুমবুমকে নিয়ে। আমি আর টুপুর একটু চরকি মারি।"

"কেন? টুপুর জায়েন্ট হুইল চড়বে না?"

টুপুরের খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। কিন্তু মিতিনমাসির সঙ্গ ছাড়তেও মন চাইছে না যে। কালকের পেনড্রাইভখানা দেখার পর থেকে মিতিনমাসি কী ভাবছে, কী করবে, বুঝতে হবে তো। সারাদিন মাসির সঙ্গে সেঁটে না থাকলে যদি কিছু মিস হয়ে যায়!

মাথা ঝাঁকিয়ে টুপুর বলল, "এখন থাক। পরে না হয়..."

"অ্যাজ ইউ উইশ!"

বুমবুম-পার্থ চলে গেল। অবনী আর সহেলিও কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন কে জানে! মিতিনের পাশে-পাশে হাঁটছিল টুপুর। এক প্রকাণ্ড চেহারার তিব্বতি কুলুর পোশাক বিক্রি করছে। মেয়েদের হাঁটুঝুল উলের জামাগুলো বেশ বাহারি। দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছিল টুপুর, হঠাৎ কাঁধে মিতিনের চাপ।

টুপুর ঘাড় ফেরাল, "কী গো?"

"ওই দ্যাখ।"

মিতিনমাসির দৃষ্টি অনুসরণ করে টুপুরের চোখ বড়-বড়। খানিক তফাতে, একটু ফাঁকা মতো জায়গায়, এক দাড়িওয়ালা সাহেবকে চেয়ারে বসিয়ে কে তার প্রতিকৃতি আঁকছে?

টুপুরের স্বর ঠিকরে উঠল, "কালকের সেই বৈজনাথ রাই না?"

"ইয়েস। আয় তো আমার সঙ্গে।"

আঁকায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বৈজনাথের ঠিক পিছনটাতে গিয়ে দাঁড়াল মিতিন। নিঃশব্দে দেখছে শিল্পীর কারিকুরি। বৈজনাথও সাহেবের মুখোমুখি একটি টুলে আসীন, হাতে পিচবোর্ডের উপর সাদা কাগজ, একবার করে চোখ উঠিয়ে দেখছেন সাহেবকে, পরক্ষণে চলছে তাঁর স্কেচ পেনসিল। এতই মগ্ন, মিতিন-টুপুরদের উপস্থিতি টেরই পাচ্ছেন না তিনি। মিনিট দশেক মতো সময় লাগল, সাহেবের পোর্ট্রেট তৈরি। তেমন তাক লাগানো না হলেও সাহেবকে দিব্যি চেনা যায় ছবিতে। সাহেবও বেজায় খুশি। মানিব্যাগ খুলে ঝটাকসে দু'খানা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন বৈজনাথকে। তারপর করমর্দন সেরে স্কেচখানা নিয়ে হাঁটা লাগিয়েছেন।

সাহেব সরে যেতেই মিতিনের স্বর বেজে উঠল, "আপ তো বহুত বড়িয়া আর্টিস্ট হ্যায় বৈজনাথজি!"

পাজামা-পাঞ্জাবির উপর হাতকাটা কুলু-জ্যাকেট পরিহিত বৈজনাথ টাকাটা রাখছিলেন পকেটে। চমকে তাকিয়ে বললেন, "আপলোগ?

আপলোগ কো কঁহি দেখা হ্যায়?"

"হ্যাঁ," মিতিন হিন্দিতেই বলল, "বিভব শর্মাজির কটেজে। গতকাল সন্ধেবেলা আপনি গিয়েছিলেন।"

সন্দিগ্ধ চোখে মিতিনকে একবার জরিপ করলেন বৈজনাথ। টুপুরকেও। তারপর গুমগুমে গলায় বললেন, "হ্যাঁ, যেতে হয়েছিল। কিন্তু আপনারা কে?"

"টুরিস্ট। বাঙালি। কলকাতা থেকে আসছি," বলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করল মিতিন। তারপর নরম স্বরে বলল, "কাল শর্মাজির মুখে আপনার ঘটনাটা শুনলাম, খুব খারাপ লেগেছে। আপনার মতো একজন শিল্পীকে এভাবে চিট করাটা ভীষণ খারাপ কাজ।"

বৈজনাথ খুশি হয়েছেন কথাটা শুনে। ঠোঁটে এক চিলতে দার্শনিক হাসি ফুটে উঠল। হাত উলটে বললেন, "কী আর করা? আমাদের নসিবই তো এরকম। ঠকাটাই তো শিল্পীদের নিয়তি।"

"কিন্তু লোক দু'টোর তো শাস্তি পাওয়া উচিত। পুলিশে কমপ্লেন করেছেন?"

"লাভ কী? তারা তো হাওয়া! তা ছাড়া আমার তো কোনও লিখিত চুক্তিও নেই।"

"আপনার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হয়েছিল কীভাবে?"

"আমি কাছেই থাকি, শাস্ত্রীনগরে। ওরা নিজেরাই আমার বাড়িতে এসেছিল।"

"কবে?"

"দিন পনেরো আগে।"

"ওরা আপনার ঠিকানা কী করে...?"

"দেখুন ম্যাডাম, আমি এক নগণ্য শিল্পী," বৈজনাথ সামান্য হাসলেন, "তবে একেবারে ফ্যালনা নই। আমার কয়েকটা পেন্টিংয়ের ফোটো ইন্টারনেটে আপলোড করা আছে। তাই দেখে কেউ-কেউ আমার ছবি কিনতেও চায়। তাদের কথা ভেবেই ইন্টারনেটে নাম-ঠিকানা দিয়ে রেখেছি।"

"ও, তার মানে নেট থেকে জোগাড় করেছে? আমি ভাবলাম, বিভব শর্মাই হয়তো আপনার কথা..."

"না-না। ওরা তো প্রথমে আমার কাছে এসেছিল। আমিই ওদের কটেজের হদিশটা দিই। বলেছিলাম, ওখানে আমার কিছু ভাল কাজের স্যাম্পেল পাবে। ওগুলো দেখে আমার কাজের দাম ঠিক করুক।"

"কিছু মনে করবেন না। আপনার ছবি মোটামুটি কী রকম দামে বিক্রি হয়?"

"ঠিক নেই। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনেরো, বিশ...। এখানে আর তো কেউ জলরঙে আঁকে না, আমার ছবির তাই একটা ডিমান্ড আছে," বৈজনাথের কণ্ঠে বেশ গর্বের সুর। পলকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "আসুন না, এখানে আমার স্টল আছে, আপনারাও দেখতে পারেন।"

দোকানটা পাশেই। খুপরি মতো জায়গা। গোটা দশেক বাঁধানো পেন্টিং ঝুলছে সেখানে। সবই কুলুর আশপাশের দৃশ্য।

ছবিগুলোয় চোখ বোলাতে-বোলাতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "লোক দু'টো আপনাকে কি এই ধরনের ছবিই আঁকতে বলেছিল?"

"না-না। ওরা তো কপি করতে দিয়েছিল, ম্যাডাম।"

"কপি?" মিতিন চোখ কুঁচকেছে, "কার ছবি?"

"রোয়েরিখ সাহেবের।"

"কুলুর কাছে যাঁর আর্ট গ্যালারি ছিল?"

"এখনও আছে। নগ্গরে। তাঁরই কয়েকটা পেন্টিং আমায় দেখাল কম্পিউটারে। বলল, ওর মধ্যে থেকে তিনখানা আমায় বানিয়ে দিতে হবে।"

"আপনি রাজি হয়ে গেলেন?"

"প্রথমটায় আপত্তি করেছিলাম। কারও ছবি নকল করা তো আমার পেশা নয়। আমি করিও না। রোয়েরিখ সাহেবের মতো ফেমাস পেন্টারের ছবি হলেও না। কিন্তু ওরা এমন ভাবে ধরল, প্রায় জোর করে কুড়ি হাজার টাকা হাতে গুঁজে দিল। বলল, আরও চল্লিশ দেবে," বৈজনাথ ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "আমারই কসুর। ছবি ডেলিভারির সময় পুরো টাকা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।"

বৈজনাথের বিরস মুখখানা দেখে খারাপ লাগছিল টুপুরের। অনুচ্চ স্বরে মিতিনকে বলল, "মা তো ছবি-ছবি করছিল, এখান থেকে একটা কিনে ফেলবে নাকি?"

মিতিন পলক ভাবল কী যেন। তারপর বলল, "থাক, পরে দেখা যাবে।"

"কিন্তু কাল সকালেই তো আমরা মানালি চলে যাচ্ছি।"

"আবার আসতেও তো পারি।"

"কেন?"

"বা রে, এই পথ দিয়েই তো ফেরা। মেলা তো তখনও চলবে। তা ছাড়া আমার সিক্সথ সেন্স বলছে...।"

"কী?"

"কিছু না। চল, তোর মা-বাবা কোথায় গেল খুঁজি। দেখি গিয়ে, কী কেনাকাটা হল।"

টুপুর টের পাচ্ছিল, মিতিনমাসি কী যেন একটা চেপে গেল। মনে-মনে একটু অভিমানই হল টুপুরের। কেন যে মিতিনমাসি ঝেড়ে কাশে না!

॥ ৪ ॥

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সহেলিদের ঘরে আড্ডা বসেছে। গায়ে কম্বল-টম্বল জড়িয়ে বেশ একখানা জম্পেশ আসর। বৈজনাথজির দুখভরা কহানি শোনাল টুপুর। অবনী জানালেন, কীভাবে আজ মেলায় তাঁর পকেট ফাঁক হয়েছে। সহেলির দরাদরির দাপটে কেমন নাস্তানাবুদ হচ্ছিল পাহাড়ি দোকানদাররা, তাও বর্ণনা করলেন রসিয়ে-রসিয়ে। বুমবুমের তো এখনও নাগরদোলার ঘোর কাটেনি, সে বসে-বসেই দুলছে। পার্থর উচ্ছ্বাস পাহাড়ি নাচাগানা নিয়ে। ডিজিটাল ক্যামেরায় ষাট-সত্তরটা ফোটো তুলেছে, ডিসপ্লের বোতাম টিপে-টিপে দেখাচ্ছে সকলকে।

অবনী জিজ্ঞেস করলেন, "ওই জায়গাটার ফোটো তুলেছ? যেখানে পশুবলি হয়?"

পার্থ বলল, "এমা, না তো! মিস হয়ে গেল?"

সহেলি বললেন, "ভালই হয়েছে। ওই রক্তারক্তির ফোটো ক্যামেরায় থাকার কোনও দরকার নেই।"

"তা বললে হবে?" অবনী বললেন, "কুলুতে রক্তপাত তো কম হয়নি। কখনও শিখরা অ্যাটাক করেছে, তো কখনও ব্রিটিশরা। এখানকার বহু শান্তিপ্রিয় মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে কুলু রাজ্যকে বাঁচাতে গিয়ে।"

"আহা, ওই খুনজখমের ফোটো তো কবেই ইতিহাস। ওসব প্রসঙ্গ এখন আবার তোলা কেন?"

"কিন্তু একটা জায়গাকে চিনতে গেলে তার সব দিকই জানতে হয়। মনে রেখো, আমোদ-আহ্লাদ, নাচাগানা, পুজো-আচ্চা, কেনাবেচা যেমন মেলার অঙ্গ, তেমনই ছাগল-ভেড়া-শুয়োর-মোষ হত্যাও আর একটা অঙ্গ। পার্থর ক্যামেরায় সমস্ত কিছুরই এভিডেন্স থাকা উচিত।" অবনী লেকচারটা দিয়ে ভারী পুলকিত হয়েছেন। চোখ নাচিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে প্রজ্ঞাপারমিতা, আই মিন, জ্ঞানের দেবী, আমি কি ভুল বলছি?"

মিতিন আলগা হাসল। তারপর হঠাৎই আলটপকা বলে উঠল, "আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম অবনীদা।"

"কী বলো তো?"

"কালকের টুর প্ল্যানটা যদি একটু বদলাই।"

পার্থ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "কী রকম? কী রকম?"

"ধরো, যদি সোজা মানালি না গিয়ে আমরা একবার নগ্গরে ঢুঁ মেরে যাই? খুব একটা অফ-রুটে তো যেতে হবে না, পথে কাতরেইন থেকে মাত্র ছ'-সাত কিলোমিটার ঢোকা।"

"কী আছে সেখানে?"

"অনেক কিছুই। এককালে কুলুরাজ্যের রাজধানী ছিল নগ্গর। আপ টু সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি। রাজা সিধ্ সিংহের তৈরি পাঁচশো বছরের পুরনো একটা দুর্গ রয়েছে। কাস্‌লটার বিশেষত্ব হল, ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পেও ওটার কিস্‌সু হয়নি। প্লাস, রাজার প্রাসাদ। বেশ কয়েকটা মন্দির। রোটাং পাস আর হিমালয়ের কিছু চুড়োও দেখা যায় নগ্গর থেকে। সুন্দর-সুন্দর আপেলবাগানও আছে," মিতিন একটা বালিশ কোলে টানল, "তবে ওগুলো দেখার জন্যে আমি তত আগ্রহী নই। আমার ইন্টারেস্ট, রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারি।"

"নগ্গরেই বুঝি গ্যালারিটা?" অবনী নড়েচড়ে বসলেন, "তা হলে তো যেতেই হয়। এত কাছে এসে ওটা না দেখা তো গ্রেট লস্।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "রোয়েরিখ কি খুব বিখ্যাত শিল্পী?"

পার্থর পাল্টা প্রশ্ন, "তুই বুঝি আগে ওঁর নাম শুনিসনি?"

"না। আজ অবশ্য বৈজনাথজি বলছিলেন।"

"দেবিকারানি কে জানিস নিশ্চয়ই?"

"উঁহু।"

"ফেমাস অ্যাকট্রেস। উনিশশো তিরিশ আর চল্লিশের দশকে গোটা ভারতবর্ষ কাঁপিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ফ্যামিলির মেয়ে। দারুণ রূপসি ছিলেন। রোয়েরিখ ছিলেন সেই দেবিকারানির বর।"

"তুমি বোধ হয় পুরোটা জানো না পার্থ," অবনী নাক গলালেন, "তুমি যাঁর কথা বলছ, তিনি স্‌ভেতোস্লাভ রোয়েরিখ। ইনিও পেন্টার ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবার খ্যাতি ভুবনজোড়া। নাম নিকোলাস রোয়েরিখ। দুনিয়ার বহু নামী-দামি গ্যালারিতে নিকোলাসের আঁকা ছবি আছে। আমার অনুমান, পেনড্রাইভের ছবিগুলো নিকোলাস সাহেবেরই পেন্টিং। কারণ যত দূর জানি, নিকোলাসের সব ছবিরই বিষয়বস্তু হিমালয়। তাঁর ছেলে স্‌ভেতোস্লাভও হিমালয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন বটে, তবে পাহাড়ের মানুষ আঁকায় তাঁর উৎসাহ বেশি ছিল। তা ছাড়া তাঁর পেন্টিংয়ের সংখ্যাও অনেক কম।"

মিতিন বলল, "আপনার আন্দাজটাই ঠিক। নিকোলাসেরই সাঁইত্রিশটা ছবি থেকে বেছে-বেছে তিনখানা কপি করতে দেওয়া হয়েছিল বৈজনাথজিকে।"

"তো?" পার্থর চোখ সরু, "তার সঙ্গে আমাদের নগ্গর যাওয়ার কী সম্পর্ক?"

"আছেও বটে। আবার নেইও বটে।"

"হেঁয়ালি করছ কেন? সাফ-সাফ বলো।"

"দ্যাখো, বিখ্যাত শিল্পীর ছবি কপি করা কোনও গর্হিত কাজ নয়। এরও একটা বাজার আছে এবং মোটামুটি ভালই বিক্রি হয়। লোক দু'টোর কাছে নিকোলাস রোয়েরিখের পেন্টিংয়ের ফোটো ছিল, ওরা তা থেকে কপি করাতেই পারে। তবু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।"

"কী রকম?"

"প্রথমত, অ্যাকর্ডিং টু শর্মাজি, লোক দু'টো এসেছিল মুম্বই থেকে। কেন? মুম্বই শহরে কি কপি করার লোকের আকাল পড়েছে? এই সাধারণ কাজটা করাতে তাদের কিনা ছুটে আসতে হল সুদূর কুলুতে? ইন্টারনেট ঘেঁটে একজন কুলুর আর্টিস্টের সন্ধান করে তাঁকে দিয়ে আঁকাতে হল? দ্বিতীয়ত, কাজটার জন্য তারা যে পারিশ্রমিক অফার করল, সেটাও মোটেই স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ কিনা বৈজনাথজিকে টাকার টোপ ঝুলিয়ে প্রলুব্ধ করা হল। কেন?"

টুপুর উত্তেজিত মুখে বলল, "শুধু তাই নয় মিতিনমাসি, ছবি তিনটের জন্য তারা বারো দিন ধরে এত দামি কটেজে রয়ে গেল!"

"কারেক্ট। এখান থেকেই আসে তিন নম্বর প্রশ্ন। যদি বৈজনাথজির টাকা মারার হিসেবটা বাদও দিই, তা হলেও লোক দু'টোর খরচখরচা, ইনক্লুডিং মুম্বই-কুলু যাতায়াত কম-সে-কম আড়াই তিন লাখের ধাক্কা। এক-একটা কপি তবে তারা কত দামে বেচবে? লাখ টাকার কমে তো পোষাবেই না। কিন্তু তা কি সম্ভব? কেউ কি কোনও ছবির কপি অত টাকা দিয়ে কেনে? কিনবে?"

"তাই তো। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে," পার্থ দু'-এক সেকেন্ড ভেবে বলল, "আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, ওরা ছবি তিনটেকে আসল পেন্টিং বলে বেচবে? ছবিগুলোকে যথাসম্ভব নিখুঁত করার জন্য এখানকার একজন শিল্পীর দ্বারস্থ হয়েছিল?"

"সেই সম্ভাবনা তো আছেই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, যদি তার চেয়েও কোনও খারাপ মতলব এঁটে থাকে।"

"আর কী হতে পারে?"

"ভাবছি। নগ্গরে গিয়ে দেখি না একবার," মিতিন বালিশ ফের পাশে রেখে বলল, "আবার এমনও হতে পারে, আমি মিছিমিছি টেনশন করছি। লোক দু'টো হয়তো সত্যিই বড়লোক ব্যবসাদার। ছবি-টবির শখ আছে। নিকোলাস রোয়েরিখের অরিজিনাল পেন্টিং তো পাওয়া দুরূহ, তাই আসার আগে নেটে খোঁজখবর করে নিয়ে বৈজনাথজিকে কপির অর্ডার দিয়েছিল। তারপর যখন মনে হয়েছে বেশি টাকা দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, তখন ছবি হাতিয়ে ভাগলবা। অর্থাৎ সিম্পল কেস অফ চিটিংবাজি। আবার বৈজনাথজিও সম্পূর্ণ ঠকেছেন তাও নয়। তিনটে ছবি কপি করার জন্য কুড়ি হাজার তো মিলেছে।"

পার্থ বলল, "তুমি তো এবার ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দিচ্ছ! একবার বলছ লোক দু'টোর ধান্দা খারাপ, আবার বলছ বদমতলব নাও থাকতে পারে।"

"নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।"

অবনী বললেন, "সে যাই হোক, নিকোলাস রোয়েরিখের পেন্টিংয়ের ব্যাপারে আমার কিন্তু যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কিছুদিন আগে একটা ম্যাগাজিনে ওঁর লাইফটা পড়ছিলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং! আদতে তো উনি রাশিয়ান। কিন্তু দেশে যথেষ্ট খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও বলশেভিক বিপ্লবের পর উনি ভারতে পালিয়ে আসেন বউ হেলেনা আর দুই ছেলেকে নিয়ে। স্‌ভেতোস্লাভ, মানে যিনি দেবিকারানিকে বিয়ে করেন, তিনি হলেন গিয়ে ছোট ছেলে। ভারতে এসে নিকোলাস এমনই হিমালয়কে ভালবেসে ফেলেছিলেন, বাকি জীবনটা ওই নগ্গরেই কাটিয়ে দেন। একটা আশ্রম মতো করে থাকতেন, পরে সেখানেই হয় তাঁর আর্ট গ্যালারি। কুলুর লোকদের হস্তশিল্পও তাঁকে খুব টানত। সেগুলো সংগ্রহ করে নগ্গরে একটা মিউজিয়ামও বানিয়েছিলেন নিকোলাস। নামটা সম্ভবত উরুসবতী সংগ্রহশালা। এমন ভাবে পাহাড়িদের সঙ্গে তিনি মিশে গিয়েছিলেন যে, সবাই তাঁকে মুনি-ঋষিদের মতো সম্মান করত। নামই হয়ে গিয়েছিল, মহর্ষি নিকোলাস। উনি মারা গিয়েছিলেন..."

"তুমি এবার থামবে?" সহেলি মৃদু ঝামরে উঠলেন, "কলেজে ক্লাস নিয়ে-নিয়ে এমন অভ্যেস হয়েছে, বক্তৃতা শুরু করলে একটা পিরিয়ডের কমে বাক্যি বন্ধ হয় না।"

"নিকোলাস সম্পর্কে যদি তুমি পড়ো..."

"আমার দরকার নেই। কাল তো নগ্গর যাবই, সেখানে গিয়েই নয় তাঁকে বুঝে নেব।"

বক্তৃতা শেষ করতে না পেরে অবনী যেন মনঃক্ষুণ্ণ। বেজার মুখে বাথরুমে চলে গেলেন।

পার্থ বলল, "আমরাই বা আর বসে থাকি কেন? ও ঘরে আমাদের কম্বলগুলো তো ওয়েট করছে, গিয়ে এবার ঢুকে পড়লেই হয়।"

মিতিন বলল, "তার আগে ঝামেলাটা মিটিয়ে এলে হত না?"

"কোনটা?"

"কটেজের পেমেন্ট-টেমেন্টের ব্যাপারটা।"

"সে তো কাল সকালেই সারতে পারি। ব্রেকফাস্ট-টেকফাস্ট না করে তো বেরোচ্ছি না।"

"সকালের জন্য ফেলে রাখার দরকার কী? তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকব," মিতিন উঠে দাঁড়াল, "চলো না, শর্মাজির সঙ্গে একটু গপ্পোসপ্পোও করে আসি।"

পার্থ হাত ওলটাল, "ওকে। মহারানির যা মর্জি।"

টুপুর পোঁ ধরল, "আমিও যাব।"

"চল।"

নীচের অফিসঘরটি ছেড়ে অন্দরে ঢুকে গিয়েছিলেন বিভব শর্মা।

দরজায় টোকা দিতে বেরিয়ে এসেছেন। সুট-টাইয়ের বদলে পরনে ঘরোয়া পোশাক। চোস্ত সাহেবি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ স্যার?"

একগাল হেসে পার্থ বলল, "তেমন গুরুতর কিছু নয়। হিসেবপত্র চোকাতে এলাম।"

"এখন?" বিভব স্মিত মুখে বললেন, "আমার তো এখনও বিল তৈরি হয়নি!"

"বানিয়ে ফেলুন। আমরা বসছি ততক্ষণ," মিতিনের ঠোঁটেও হাসি, "কাল সকালের ব্রেকফাস্ট চার্জটা আমরা নগদ দিয়ে যাব।"

"যা আপনাদের অভিরুচি।"

কুলু শালখানা গায়ে ভাল করে সাপটে টেবিলে বসলেন বিভব। ক্যালকুলেটরে হিসেব কষছেন দু' রাত্তিরের থাকার সঙ্গে ডিনার, ব্রেকফাস্ট, চা-কফি।"

উলটো দিকের চেয়ার থেকে ঝুঁকে দেখছিল মিতিন। কাজের মাঝেই আলাপ জুড়ল, "আজ মেলায় বৈজনাথজির সঙ্গে দেখা হল।"

"তাই নাকি? এখনও নিশ্চয়ই খুব রেগে আছেন?"

"রাগের চেয়েও বোধ হয় দুঃখ পেয়েছেন বেশি।"

"আমারও তো বদনাম হয়ে গেল।"

"কেন?"

"আমাদের কুলুতে বৈজনাথজির খুব সম্মান। তাঁকে কিনা দাগা দিল আমারই দু'জন বোর্ডার?"

"আপনি কি ওদের আগে থেকে চিনতেন?"

"একেবারেই না। আমার কটেজে তো এই প্রথম উঠল এবং আগেও নাকি কখনও কুলুতে আসেনি।"

"দু'জনেই তো মুম্বইয়ের? মরাঠি?"

"পদবি দেখে মনে হয় একজন মহারাষ্ট্রের, নবীন তারকুণ্ডে। অন্যজন পঞ্জাবি, সুখদেব ভাটিয়া," বিভবের আঙুল থেমেছে। চোখ তুলে বললেন, "দু'জনকেই তো ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল। কথাবার্তা খুব সুন্দর, কোনও রকম বেলেল্লাপনা করেনি। সঙ্গে একটা মারুতি ভ্যান ছিল বটে, তবে বড় একটা বেরোত না। এই হয়তো আশপাশে হেঁটে-হেঁটে ঘুরছে, ক্যামেরায় ফোটো তুলছে।"

"তার মানে আর পাঁচটা টুরিস্টের মতো নয়?"

"এখানে সব রকম লোকই আসে। অবশ্য মূলত আমার বোর্ডাররা বেশির ভাগই বিদেশি। কেউ হয়তো সারাদিন টো টো করে, আবার কেউ হয়তো একটি বারের তরেও ভ্যালিতে নামে না। এই তো, পরশু সকালের ফ্লাইটে এক ইতালিয়ান ভদ্রলোক আসছেন, রবার্তো জোয়ান্নি। গত বছরও একবার এসেছিলেন এরকমই সময়ে। উনি আবার শুধুই শিল্পকলার ভক্ত। দশেরার মেলা থেকে কত কী যে কিনে নিয়ে গেলেন। তার মধ্যে বৈজনাথজির ছবিও তো ছিল।"

ফের হিসেবে মাথা নামাল বিভব শর্মা। একটা কাগজে বকেয়া টাকার অংশটা লিখে বাড়িয়ে দিলেন পার্থকে। হেসে বললেন, "কাল কম্পিউটারে পাকা বিলটা বানিয়ে দেব। অসুবিধে নেই তো?"

"কিছুমাত্র না।"

টাকা মিটিয়ে উপরে এল তিনজন। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে তুলে নিজেদের বিছানায় নিয়ে গেল পার্থ। টুপুরকে 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে মিতিনও গেল শুতে।

অবনী-সহেলির নাক ডাকছে। টুপুরের কে জানে কেন ঘুম আসছিল না। বাইরে একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ। হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যাচ্ছে শব্দ, আবার শুরু হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে। কম্বল সরিয়ে টুপুর জানলায় এল। বন্ধ কাচের ওপারে এক মনোরম জ্যোৎস্না। চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে। অদূরে, পাহাড়টার গায়ে আলোর পাতলা সর। চোখ যেন ফেরানো যায় না। তাকিয়ে আছে টুপুর, তাকিয়েই আছে।

পরদিন বেরোতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। এক বিকেলেই যা রাজ্যের জিনিস কিনেছেন সহেলি, গোছগাছ করতে প্রাণান্ত। এটা যেন না ভাঙে, ওটা যেন দুমড়ে না যায়। তারপর জলখাবার সেরে, সকলকে তৈরি করে মালপত্র গাড়ির ছাদে তোলো রে, বাঁধো রে, সেও তো কম হাঙ্গামা নয়।

কুলু থেকে নগ্গর, পথে চড়াইটাই বেশি। কাতরেইনের পর বিপাশা পেরোল গাড়ি। তারপর থেকে রাস্তা বেজায় ভাঙাচোরা। যথেষ্ট সাবধানে চালাচ্ছে টিঙ্কু, তবু সহেলি সিঁটিয়ে বসে। বাইরে চন্দ্রখনি পাহাড়ের অপরূপ শোভা, সেদিকেও তাকাচ্ছেন না।

নগ্গরে পৌঁছে পথঘাটের খানিক উন্নতি হল। কংক্রিটের চড়াই, কুলুরাজার দুর্গ পেরিয়ে, যখন গাড়ি রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারির কাছে এল, সূর্য তখন মাঝ আকাশে।

কিন্তু দোতলা বাড়িটার সামনে এ কী দৃশ্য?

দু'-দু'খানা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে! নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট মিউজিয়াম পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ!

॥ ৫ ॥

পার্থ নেমে দেখতে গিয়েছিল। উত্তেজিত মুখে ফিরেছে। বিস্ফারিত চোখে বলল, "কেলেঙ্কারি কাণ্ড! কাল রাত্তিরে নাকি চোর এসেছিল আর্ট গ্যালারিতে।"

সহেলি প্রায় আঁতকে উঠেছেন, "কী সর্বনেশে কথা! এখানে চোর-ছ্যাঁচোড় আছে নাকি?"

"মন্দ লোক কোথায় নেই দিদি?" মিতিন থামাল সহেলিকে। পার্থকে জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে বোঝা গেল? দরজা-জানলা কিছু ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ। পিছনের একটা জানলা। শুধু কাচ নয়, লোহার গ্রিলও নাকি কেটেছে।"

"রাতে পাহারা ছিল না?"

"থাকে তো। আর্মড গার্ড। তার নাকি রাত আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি। সকালে যার ডিউটি সে নাকি এসে রাতের গার্ডটাকে দেখতে পায়নি। এপাশে-ওপাশে খুঁজছিল, তখনই আবিষ্কার করে ভাঙা জানলাটা। ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে এখানকার কর্তাকে জানায়। তিনি এসে পুলিশে ফোন করেন। তারপর পুলিশ চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় লোকটাকে। একটা ঝোপের মধ্যে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায়।"

"ও," মিতিন একটুক্ষণ ঝুম মেরে রইল। ফের প্রশ্ন করেছে, "তা কী-কী খোওয়া গিয়েছে?"

"সেটাই তো ভারী অদ্ভুত। এখানকার ম্যানেজারসাহেব নাকি গ্যালারি ঘুরে দেখেছেন। কিছুই নাকি চুরি যায়নি।"

"তাই বুঝি? চোর তা হলে এল কেন?"

"গড নোজ। পুলিশও তো অবাক।"

"কে বলল তোমায় এত সব?"

"সিকিওরিটির লোক। সে বেচারা তো ঘাবড়েছে জোর। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জানতে হল। ভিতরে নাকি পুলিশের বড় অফিসার আছেন। ম্যানেজারসাহেবের সঙ্গে তাঁর বাতচিত চলছে এখন," পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "আর কী, গ্যালারি আজ বন্ধ। চল, আমরাও কাটি।"

অবনী হতাশ গলায় বললেন, "ছবিগুলো তা হলে দেখা যাবে না?"

"উপায় নেই অবনীদা। ওরা নাকি ভিজিটর অ্যালাউ করছে না। আমাদের আগে তিন-চারটে গাড়ি এসেছিল, তারাও ব্যাক করেছে।"

"হুম," মিতিন আবার ভাবল দু'-এক সেকেন্ড। ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বলল, "আমি একবার ট্রাই নিয়ে দেখব?"

"লাভ নেই। চৌকাঠও পেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ।"

"তবু দেখি, এসো তো সঙ্গে।"

দোতলা বাড়িটার দিকে এগোল মিতিন। টুপুর-পার্থও চলেছে পিছু-পিছু। যেতে-যেতে বাড়িটাতে চোখ বোলাচ্ছিল টুপুর। বেশ বড়সড়ই। পুরনো, তবে বোঝা যায় রক্ষণাবেক্ষণ ভাল। বারন্দায় উঠেই প্রকাণ্ড দুয়ার বন্ধ। মাথায় প্লেট সাঁটা 'নিকোলাস রোয়েরিখ হল'। তিন-চারজন উর্দিধারী ঘোরাফেরা করছে বারান্দায়, তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে মিতিন সোজা অফিসের দরজায়।

গলা বাড়িয়ে মিতিন বলল, "মে আই কাম ইন?"

"হোয়াই?" অন্দর থেকে ইংরেজিতেই পালটা প্রশ্ন উড়ে এল, "দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা এখন ব্যস্ত?"

"সেই জন্যই তো আসতে চাই। আমি বোধ হয় আপনাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি।"

"তাই নাকি?" স্বরটা খানিক নরম হল, "আসুন।"

ছিমছাম আধুনিক অফিসঘর। কাচের টেবিল, কম্পিউটার, রিভলভিং চেয়ার শোভিত। দেওয়ালে বেশ কয়েকটা ফোটোগ্রাফ। তিন দাড়িওয়ালা সাহেব, এক স্বর্ণকেশী মেম আর রূপসি দেবিকারানি। টুপুর আন্দাজে বুঝে নিল, কালো টুপি পরা সাধু-সাধু চেহারার মানুষটি নিশ্চয়ই নিকোলাস রোয়েরিখ। বাকি দু'জন সম্ভবত তাঁর ছেলে, সোনালি চুল শ্বেতাঙ্গিনী নিকোলাসের স্ত্রী হেলেনা।"

ঘুরনচেয়ারে কপালে হাত চেপে বসে মধ্যবয়সি ম্যানেজার সাহেব। উলটো দিকে এক আই পি এস। ফরসা শক্তপোক্ত চেহারা, সরু গোঁফ, নিখুঁত কামানো গাল, বয়স বছর চল্লিশ। তিনিই ভারী গলায় বললেন, "শুনি আপনাদের বক্তব্য।"

"একটু সময় লাগবে," মিতিন ঠোঁটে হাসি-হাসি ভাব ফোটাল, "বসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

শুধু মিতিন নয়, পার্থ-টুপুরও ঝুপঝাপ বসল চেয়ারে। গলা ঝেড়ে মিতিন বলল, "আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে আমার হাজব্যান্ড আর বোনঝি। বাইরে গাড়িতে আমার দিদি-জামাইবাবু আর ছেলে রয়েছে। আমরা কুলু-মানালি বেড়াতে এসেছি।"

"ওকে। ওয়েলকাম টু আওয়ার ভ্যালি। আমি কুলুর এস-পি আশুতোষ শাহ। নাউ প্রসিড।"

"শুনলাম, কাল রাতে কে বা কারা এই গ্যালারিতে হানা দিয়েছিল?"

আশুতোষ যেন পলক জরিপ করলেন মিতিনকে। কেটে-কেটে বললেন, "ইয়েস। থ্যাঙ্ক গড, কিছু চুরি যায়নি। তবে ঘটনাটায় আমরা বিশেষ বিচলিত।"

"আমিও। কারণ আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের ধারণাটা সঠিক নয়।"

"মানে?"

"এক সেকেন্ড," বলেই ঝটাক ঢাউস ব্যাগখানা খুলল মিতিন। পেনড্রাইভটা বের করে আশুতোষকে বাড়িতে দিয়ে বলল, "আপনি কি এটা একটু চালাবেন?"

"কী আছে এতে?"

"প্লিজ, একবার ওপেন করে দেখুন।"

ম্যানেজারকে পেনড্রাইভখানা দিলেন আশুতোষ। অন করা হল কম্পিউটার। যথাস্থানে পেনড্রাইভ লাগানোর পর ছবির ঝাঁক ফুটে উঠেছে মনিটরে।"

ম্যানেজার বিস্মিত স্বরে বললেন, "এ তো নিকোলাস সাহেবের পেন্টিং।"

"গ্যালারিতে নিকোলাস সাহেবের ক'টা পেন্টিং আছে?"

"সাঁইত্রিশটা।"

"এখানে দেখুন, সাঁইত্রিশখানা ছবিই আছে।"

"হ্যাঁ তো! তাই তো!"

"ভাল করে লক্ষ করুন। সাঁইত্রিশটার মধ্যে তিনখানা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা আছে। উইথ ক্রস মার্কস।"

"হ্যাঁ, আছে।"

"আপনি কি অনুগ্রহ করে ওই তিনটে পেন্টিং আর একবার চেক করে আসবেন? পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে?"

ম্যানেজার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকিয়ে। একবার মিতিনকে দেখছেন, একবার আশুতোষকে। ঢোক গিলে বললেন, "আপনি কী সন্দেহ করছেন, ম্যাডাম?"

"দেখে আসুন না, প্লিজ।"

আশুতোষ উঠে দাঁড়িয়েছেন। ম্যানেজারকে বললেন, "চলুন, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।"

দু'জনে বেরিয়ে যেতেই পার্থ নিচু গলায় বলল, "জোর একটা ঢিল ছুড়ে দিলে তো! লাগে তুক, না লাগে তাক!"

"না স্যার। দুইয়ে দুইয়ে চারই হয়, পাঁচ নয়।"

এক মিনিট গেল, দু' মিনিট, চার মিনিট। চোরা টেনশনে ছটফট করছিল টুপুর। বসে থাকতে পারল না, উঠে গিয়ে ফোটোগ্রাফগুলো দেখছে কাছ থেকে। পরিচয় দেওয়া আছে ফোটোর তলায়। জন্ম-মৃত্যুর তারিখও। জানা গেল নিকোলাসের বড় ছেলের নাম ইউরি।

টুপুর চাপা গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "ইউরিও কি পেন্টার?"

"না। উনি ছিলেন মহাপণ্ডিত। এশিয়া আর ইউরোপের মোট তিরিশখানা ভাষা জানতেন। সংস্কৃত আর তিব্বতি ভাষায় ইউরির লেখা ডিকশনারিও আছে।"

"ফ্যামিলিটা হেভি তো! প্রত্যেকেই রত্ন!"

"তবে বাবাই সবার সেরা। কাল রাত্তিরে ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখছিলাম, নিকোলাস রোয়েরিখ শুধু চিত্রশিল্পী নন, দার্শনিক, কবি, লেখক ও ভূপর্যটক। মধ্য এশিয়া থেকে এই হিমালয়, এরিয়াটার মধ্যে উনি প্রায় বারো হাজার মাইল হেঁটেছেন।"

পার্থ বলল, "আমিও একটা ইন্টারনেটের ইনফরমেশন দিতে পারি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্মারকচিহ্নগুলো রক্ষা করার জন্য নিকোলাস রোয়েরিখ একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পরে ওই ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। রোয়েরিখ প্যাক্ট।"

টুপুর বলল, "সত্যি, কুলুতে না এলে এত খবর..."

বাক্য শেষ হল না। হুড়মুড়িয়ে ঢুকেছেন ম্যানেজার। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "গজব হো গয়া! গজব হো গয়া!"

মিতিন তাড়াতাড়ি বলল, "শান্ত হোন স্যার। কী দেখলেন বলুন?"

"ওই তিনখানা ছবি বদল হয়ে গিয়েছে! পিছন থেকে ফ্রেম খুলে আসলি পেন্টিং হটিয়ে নকলি ছবি পুরে দিয়ে গিয়েছে শয়তানরা। আমি এখন কী করি? আমি এখন কী করব? ওফ্, আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করছে।"

"আহা, আপনি ভেঙে পড়লে তো চলবে না। মন শক্ত করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করুন।"

আশুতোষ শাহ দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আস্তে-আস্তে চেয়ারে এসে বসলেন। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মিতিনকে। খর গলায় বললেন, "আপনি পেনড্রাইভটা কোত্থেকে পেয়েছেন?"

"হাতে এসে গেল," মিতিন নিরুত্তাপ, "চান্স অকারেন্স।"

"জবাব ঠিকঠাক পেলাম না। খুলে বলুন।"

"কুলুর এক প্রাইভেট কটেজে। যেখানে আমরা উঠেছিলাম। আগে যারা ছিল, তারা ফেলে গিয়েছিল। সম্ভবত ভুল করে।"

"পেনড্রাইভ দেখে আপনি বুঝে ফেললেন, এখানে ছবি চুরি হবে?"

"না। তবে একটা কোনও গড়বড় হতে চলেছে, এমনটা আমি অনুমান করেছিলাম।"

"আশ্চর্য অনুমানশক্তি তো আপনার!" আশুতোষের গলায় শ্লেষ, "আপনি কী করেন বলুন তো? সি বি আই-টি বি আইতে আছেন নাকি?"

"উঁহু। তবে প্রায় ওই ধরনেরই কাজ," মিতিন ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিল, "এতে আমার পেশা লেখা আছে।"

কার্ডখানায় চোখ রেখে থমকেছেন আশুতোষ। বিড়বিড় করে বললেন, "ডিটেকটিভ এজেন্সি? থার্ড আই? আপনি চোর-ডাকাত ধরে বেড়ান?"

"রহস্যের সমাধানও করি," মিতিন আলতো হাসল, "তবে পদে-পদে আপনাদের সাহায্য তো লাগেই। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অনেক অফিসারের সঙ্গেই আমায় যোগাযোগ রাখতে হয়। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের আই জি অনিশ্চয় মজুমদার তো আমায় অত্যন্ত

স্নেহ করেন। আমার মোবাইলে ওঁর নাম্বার আছে, কথা বলে দেখবেন?"

"না-না, প্রয়োজন নেই," আশুতোষের মুখের কাঠিন্য অনেকটা কেটেছে। কী একটা ভাবলেন যেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "এনিওয়ে, আপনাকে ধন্যবাদ। ভাগ্যিস পেনড্রাইভটা আপনার হাতে পড়েছিল! নইলে ছবির বদল তো ডিটেক্টই হত না!"

"হ্যাঁ। পাকা হাতের নকল তো, চট করে তফাত বোঝা দায়।"

"আপনি জানলেন কী করে? আপনি তো নকল ছবি দেখতে যাননি?"

"কারণ ছবিগুলো যিনি কপি করেছেন, তাঁকে আমি চিনি। তাঁর হাতের কাজ আমি দেখেছি। তাঁকে যে ছবিগুলো আঁকতে দেওয়া হয়েছিল, তাও আমি জানি।"

"কে তিনি?"

"এখানকারই এক আর্টিস্ট। কুলুর শাস্ত্রীনগরে বাড়ি। নাম বৈজনাথ রাই।"

"আপনি তাঁর সন্ধান পেলেন কী ভাবে?"

সংক্ষেপে বৈজনাথের কাহিনিটা আশুতোষকে বলল মিতিন। শুনে আশুতোষ মহা উত্তেজিত। বললেন, "জব্বর একটা ক্লু দিয়েছেন তো! এক্ষুনি আমি বৈজনাথকে পাকড়াও করছি।"

মিতিন বলল, "কেন? কোন গ্রাউন্ডে?"

"যে লোকগুলো চুরির সাসপেক্ট, উনি তাদের নকল ছবি সাপ্লাই দিয়েছেন। এটাই তো যথেষ্ট কারণ।"

"কিন্তু বড়-বড় পেন্টারের ছবি কপি করা তো কোনও অপরাধ নয়।"

"হতে পারে। তবে সেই ছবি যখন কোনও গ্যালারিতে আসলের জায়গায় ঠাঁই পায় গ্যালারির কর্তাদের অগোচরে, তখন সেটা আর আদৌ নির্দোষ থাকে কি? তা ছাড়া বৈজনাথকে ধরে আনার আর একটা যুক্তিও আছে। পেটে চাপ দিলে ভুসভুস করে দুই চোরের হদিশ বেরিয়ে আসতে পারে।"

"আমি কিন্তু যতটুকু দেখেছি, বৈজনাথকে আমার খুব একটা সন্দেহজনক মনে হয়নি। ইচ্ছে হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই পারেন। তবে তার আগে কি লোক দু'টোকে চেজ করা বেশি জরুরি নয়?" মিতিন সোজা হয়ে বসল, "চুরি তো হয়েছে সেই রাত্তিরবেলা, তাই না?"

"হ্যাঁ। দু'টো নাগাদ। যদি সিকিওরিটি গার্ডের জবানবন্দি সঠিক হয়।"

"কেন মিস্টার শাহ? তার কি ভুলভাল স্টেটমেন্ট দেওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

"বিলক্ষণ। আতঙ্কে তার যা জবুথবু দশা! কিছুই তো তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। প্রচুর ধমকে-ধামকে, বাবা-বাছা করে, জানা গেল, একটা শব্দ শুনে সে নাকি ওই সময় গ্যালারির পিছন দিকে দৌড়েছিল, তখনই দু'টো লোক তার উপর ঝাঁপায়। তারপর তার হাত-পা-মুখ বেঁধে, শ'খানেক মিটার তফাতে এক ঝোপে ফেলে দেয়। ওই গার্ডের কথার উপর নির্ভর করে একেবারে ঠিকঠাক সময়টা কি বোঝা সম্ভব?

"তাও যদি সময়টা রাত তিনটে বা রাত একটাও হয়, তা হলেও তো ন'-দশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। চোর দু'টো পালানোর জন্য কত সময় পেয়ে গিয়েছে ভাবুন!"

"হুম্!" আশুতোষের কপালে মোটা ভাঁজ পড়ল, "যদি মান্ডি পৌঁছে গিয়ে থাকে, তা হলে তো আমার নাগালের বাইরে। মান্ডি থেকে সিমলা, চণ্ডীগড়, কাংড়া ভ্যালি, যেদিকে খুশি পালাতে পারে।"

"তা হলে উপায়?"

নাক কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন আশুতোষ। ঠোঁট ছুঁচলো করে বললেন, "সনাতন পদ্ধতিতে এগোই। এখনই চারদিকে মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। এমনকী চণ্ডীগড়েও।"

"রোটাং পাস? ওদিক দিয়েও তো..."

"হ্যাঁ। কেলংকেও জানাব। সর্বত্র রেড অ্যালার্ট জারি হয়ে যাক। পথে প্রতিটি গাড়ি চেক করুক পুলিশ," আশুতোষের চোয়াল শক্ত হল, "আর ব্যাটারা যদি কোনও ভাবে কুলুভ্যালিতে থাকে, তা হলে তো আমার মুঠোয়। বেরনোর সব রাস্তা সিল করে দিচ্ছি। বাই দা বাই, লোক দু'টোর যেন কী গাড়ি?"

"মারুতি ভ্যান।"

"কালার? নম্বর?"

"সেগুলো তো বিভব শর্মা, মানে কটেজের মালিক বলতে পারবেন।"

"তাঁর নম্বর আপনাদের কাছে আছে?"

"কার্ড আছে।"

"দিন। লোকাল টিভি চ্যানেলকেও খবর পাঠাচ্ছি, আধ ঘণ্টা পর পর যেন নিউজটা প্রচার করে।"

"লোক দু'টোর আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু নামটুকু যা আছে। সেটাও ফল্‌স হতে পারে।"

"নো প্রবলেম। বিভব শর্মার সঙ্গে কথা বলছি। বাছাধনদের ছাড়া নেই।"

"পালানোর আর একটা পথও কিন্তু আছে মিস্টার শাহ্। ভুন্টার এয়ারপোর্ট।"

"সেখানেও নির্দেশ চলে যাচ্ছে। এখন অবশ্য আর ফ্লাইট নেই। সকালের ফ্লাইটে যদি না পালিয়ে থাকে! এনিওয়ে, দেখছি।"

মিতিনের থেকে কার্ডটা নিয়ে তড়াক চেয়ার ছাড়লেন আশুতোষ। দ্রুত পায়ে বেরোচ্ছেন বাইরে। মিতিন প্রায় পিছন-পিছন দৌড়ল, "মিস্টার শাহ, একটা অনুরোধ ছিল।"

আশুতোষ ঘুরে তাকালেন, "বলুন?"

"যদি ভাঙা জানলার ওদিকটা একটু সরেজমিন করি, আর সিকিওরিটিটার সঙ্গে একবার কথা বলি?"

"খুব কৌতূহল হচ্ছে নাকি?"

"বোঝেনই তো, ধান না ভানলে ঢেঁকির শান্তি হয় না!"

আশুতোষ হেসে ফেললেন, "ওকে। দেখুন ঘুরে-ঘুরে।"

## ॥ ৬ ॥

রোয়েরিখ শিল্প প্রদর্শশালার সামনের প্রাঙ্গণে এখনও পুলিশের জটলা। অদূরে টুপুরদের গাড়ি। ফাঁকা। অবনী, সহেলি, বুমবুম, কেউ নেই। গেলেন কোথায় সকলে?"

খানিকটা তফাতে পুলিশ জিপের ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিল টিঙ্কু। ভিতর থেকে টুপুরদের বেরিয়ে আসতে দেখে এগিয়ে এসেছে। ঘাড় চুলকে বলল, "বড়াসাবরা সকলে উপরে গিয়েছেন। মিউজিয়াম দেখতে।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "উরুসবতী?"

"হাঁ জি। উধার ভি বহুত বড়িয়া-বড়িয়া চিজ আছে।"

"কতক্ষণ গিয়েছেন?"

"আধা ঘণ্টা," টিঙ্কু ঘড়ি দেখল, "এই গ্যালারি তো আজ আর খুলবে না। ওদের ডেকে আনব? এখন রওনা দেবেন?"

"একটু পরে। আমরা আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকছি।"

টিঙ্কুর চোখে-মুখে পলকা বিস্ময়। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

মিতিন পার্থকে বলল, "তুমিও মিউজিয়ামটা ঘুরে আসবে নাকি?"

"কতটা উঠতে হবে?"

"বোধ হয় এক-দু'শো মিটার। চাইলে যেতে পার। আমি ততক্ষণ এদিকে..."

"আমাকে ভাগাতে চাইছ?"

"তা কেন? ভাবছিলাম না দেখে পরে যদি আফশোস করো!"

"তুমি যাবে না?"

"তোমাদের মুখে ডিটেলে শুনে নেব।"

"বুঝলাম। তুমি কেসটায় ভিড়তে চাইছ!"

"ঠিক তা নয়। জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা। কীভাবে কী ঘটল।"

"বেড়াতে বেরিয়ে মিছিমিছি বখেড়ায় ঢুকছ। করো যা খুশি।"

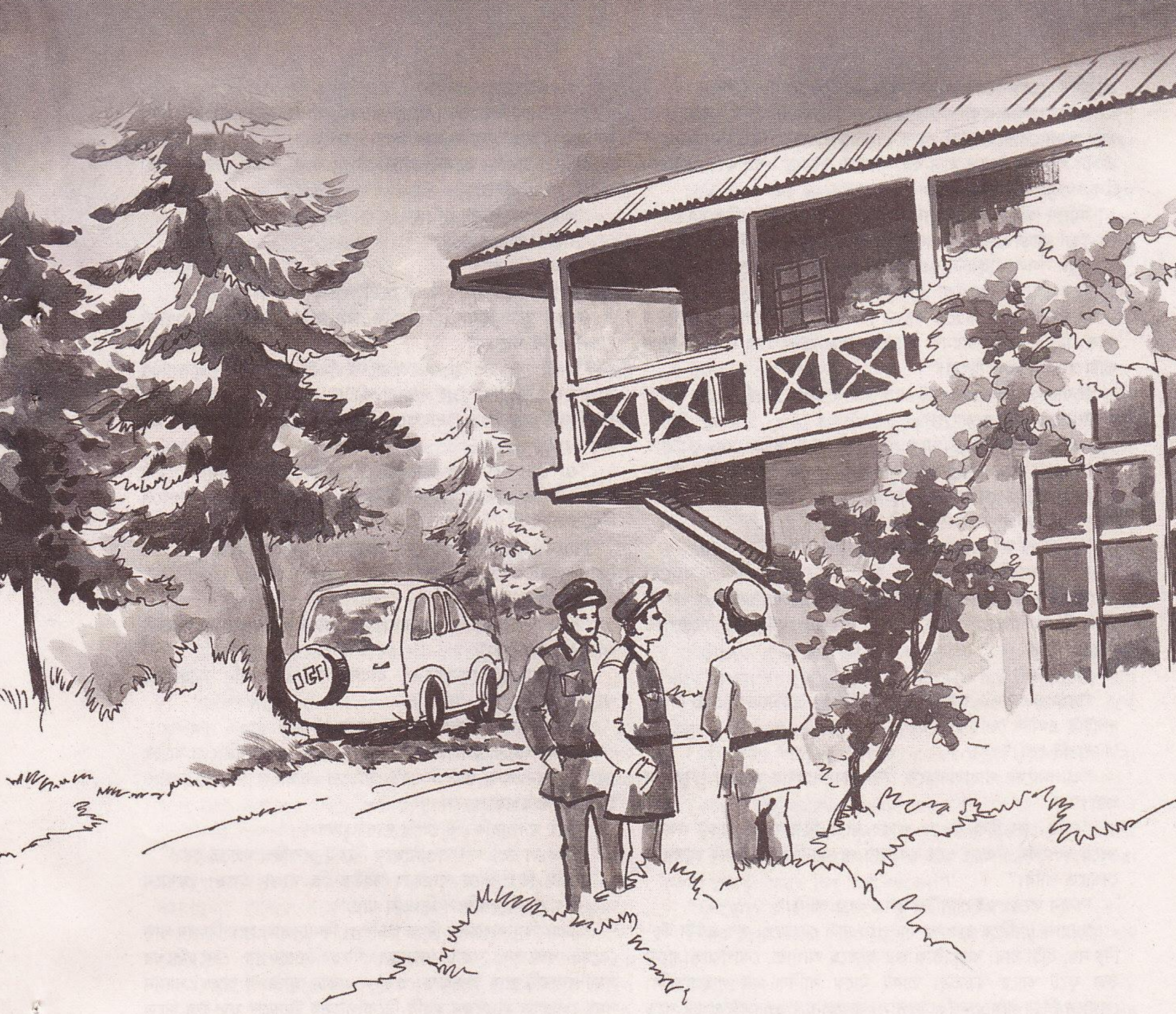

ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখে পার্থ চলে গেল। দেবদারু আর পাইনে ছাওয়া উপরে ওঠার রাস্তাটা ধরেছে। মিতিন হাসল মৃদু! টুপুরকে বলল, "দাঁড়া এক সেকেন্ড। ম্যানেজারসাহেবকে ডেকে আনি।"

টুপুর মনে-মনে বেজায় খুশি। পার্থমেসোকে সরিয়ে তাকে সঙ্গে রাখল মাসি! অর্থাৎ কিনা তাকেই মিতিনমাসি সত্যিকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাবছে! কিন্তু লোক দু'টোকে মাসি এখন ধরবে কী করে? পুলিশই বা কোথায়-কোথায় ধাওয়া করবে? নিজের বাহনে বসে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে চতুর্দিকে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন আশুতোষ শাহ। তবে তাতেই কি সাফল্য মিলবে? এমন তো হতে পারে, লোক দু'টো মারুতি ভ্যানখানা ছেড়ে দিয়েছে! বাসে বা অন্য কোনও উপায় যদি ধাঁ মেরে থাকে?

ভাবনার মাঝেই মিতিনের পুনরাগমন। ভীত-সন্ত্রস্ত ম্যানেজার সাহেবসহ। টুপুরকে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে গ্যালারির পিছন পানে চলল মিতিন। হাঁটতে-হাঁটতে ভদ্রলোককে বলল, "আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি স্যার।"

"আমি কিষানলাল দুগ্‌গার।"

"কত দিন গ্যালারির চার্জে আছেন?"

"তা প্রায় ষোলো বছর। শুধু আর্ট গ্যালারি নয়, পুরো হল, এস্টেটটারই আমি দেখাশোনা করি। এখানকার ট্রাস্টি বোর্ড আমাকে নিয়োগ করেছেন," কিষানলাল জোরে শ্বাস ফেললেন, "এর আগে কখনও এরকম বাজে ঘটনা ঘটেনি। ট্রাস্টি বোর্ডকে যে আমি কী কৈফিয়ত দেব?"

"ইন্টারনেটে দেখছিলাম, বোর্ডে নাকি অনেক বিদেশিও আছেন?"

"হ্যাঁ। নানান দেশের। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, চিন, জাপান। শুরুতে তো বোর্ডে দু'জন বাঙালিও ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু আর রবীন্দ্রনাথ টেগোর।"

টুপুর চমৎকৃত। বলল, "ও বাবা, এ তো তা হলে সত্যিই বিশাল ব্যাপার!"

"অবশ্যই।"

এক প্রকাণ্ড সিডার গাছের কাছে এসে থামলেন কিষানলাল। টুপুরকে বললেন, "ওই পাথরের মূর্তিগুলো দেখছ, এঁরা কুলুর রক্ষক। স্থানীয় মানুষদের এরকমই বিশ্বাস, কালী, কার্তিক, নরসিংহ, সকলেই কুলুর অভিভাবক। ঘোড়ার পিঠে মূর্তিটা গুগা চহ্বাণের। ইনি সমস্ত দেবতাদের নেতা। এখানকার ভাঙাচোরা মন্দির থেকে নিকোলাস সাহেব মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে এনেছিলেন। পুরোহিত এসে এখনও

প্রতিদিন পুজো করেন, শাঁখ বাজান, মূর্তিতে চন্দন লেপেন।"

কথায়-কথায় একটু যেন সহজ হয়েছেন কিষানলাল। খোলামেলা মন্দিরখানা পেরিয়ে পায়ে-পায়ে বাড়িটার পিছনে পৌঁছেছেন। সামনেই একটা গ্যারাজ, দেখে মনে হয় সারানো হয়েছে সম্প্রতি। গ্যারাজের ঠিক পরেই কাচভাঙা জানলা।

মিতিন আঙুল তুলে বলল, "ওটাই ব্রেক করেছিল নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। নিখুঁত কেটেছে। দেখুন, পাশে কাচটাও পড়ে।"

টুপুর বলল, "কাচটা তো আস্তই আছে। এত সুন্দর ভাবে কাটল কী করে?"

জায়গাটা পরখ করতে-করতে মিতিন বলল, "পেশাদার হাতের কাজ। নির্ঘাত সঙ্গে ডায়মন্ড পয়েন্টেড যন্ত্র ছিল। তবে লোহার গরাদ কাটা হয়েছে হ্যান্ড ড্রিলে।"

কিষান বললেন, "তখনই বোধ হয় আওয়াজ হয়েছিল। যা শুনতে পেয়ে প্রসাদ দৌড়ে আসে।"

একটা জিনিস কিন্তু চোখে পড়ার মতো," মিতিন ঘাড় ঘোরাল, "আপনাদের জানলাটা শুরু হয়েছে মাটির প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু থেকে। জানলার হাইটও মোটামুটি ছ' ফুট। এত বড় একটা অংশ একেবারে মাপে-মাপে কাটা রীতিমতো কঠিন কাজ।"

"বোধ হয় জানলার কারনিসে চড়েছিল।"

"কিন্তু কারনিসও তো বেশ সরু। দাঁড়ানো মুশকিল," বলতে-বলতে ঘাসে উবু হয়ে বসেছে মিতিন। আঙুল চেপে-চেপে দেখল কী যেন। কিষানলালকে ডেকে বলল, "এখানে ছোট-ছোট দু'টো গর্ত রয়েছে।"

"কিসের?"

"সম্ভবত সঙ্গে ফোল্ডিং মই এনেছিল। মেটালের। মই রাখার দাগটাই এখানে তৈরি হয়েছে।"

"তাই তো!"

"আপনাদের পাহারাদারকে ঠিক কোনখানটায় অ্যাটাক করেছিল ওরা?"

"সেটা তো ঠিক বলতে পারব না," কিষানলাল একটু থমকে থেকে বললেন, "তবে ওকে কোথায় পাওয়া গিয়েছে, সেই জায়গাটা দেখাতে পারি।"

"চলুন তবে। ওই স্থানটিও দর্শন করে আসি।"

গ্যারাজ পেরিয়ে হাত দশেক পরে ঢাল নেমেছে। খুব একটা উঁচু-নিচু নয়, হাঁটা যায়। অল্প গিয়ে শুরু হয়েছে আগাছা, ঝোপঝাড়। বুনো ফুল ফুটে আছে যত্রতত্র। তারই মাঝে খানিক ঘন গাছগাছালি। সেখানে গিয়ে থামলেন কিষানলাল। বললেন, "ওখানেই প্রসাদ পড়ে ছিল।"

টুপুর বিস্ময়ের সুরে বলল, "এত দূর টেনে এনেছে?"

"তাও তো প্রসাদের কপাল ভাল। আর পাঁচ-ছ' হাত গেলেই খাদ। ফেলে দিলে প্রসাদের আর চিহ্নই থাকতে না।"

"যাক বাবা, লোক দু'টো আর যাই হোক, খুনে নয়।"

"প্রসাদের বন্দুকটাও হাতায়নি। ঝোপের পাশে পড়ে ছিল।"

মিতিন কোনও মন্তব্য করল না। চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করছে ঝোপঝাড়। তরতরিয়ে কয়েক পা হাঁটল। সামনে যাচ্ছে, পিছনে যাচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে দেখল কী যেন। তারপর হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "এবার আপনাদের প্রসাদের সঙ্গে একটু কথা বলা যাক।"

চওড়া কাঁধ, মাঝারি হাইটের হিমাচলি প্রসাদ ডোগরা এখন একটি টুলে বসে। পরনের নীল উর্দি ধুলোমাটি মাখা। কেমন যেন ঝিমোচ্ছে মাথা নামিয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বন্দুকধারী।

পাহারাদারদের ঘরটিতে ঢুকে মিতিন কিছুক্ষণ স্থির চোখে জরিপ করল প্রসাদ ডোগরাকে। অল্প গলা উঠিয়ে বলল, "এই যে প্রসাদজি, শুনছেন?"

মুখ তুললেন বছর পঞ্চাশের মানুষটি। অতি কষ্টে চোখ খুলে বললেন, "আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব যে।"

কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কিষানলাল ঈষৎ কড়া স্বরে বললেন, "সিধে হয়ে বোসো প্রসাদ। ম্যাডাম যা প্রশ্ন করবেন তার জবাব দাও।"

সামান্য টানটান হলেন প্রসাদ। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "হাঁ ম্যাডামজি, বোলিয়ে?"

"কাল যখন শব্দটা পেলেন, তখন ঠিক কোথায় ছিলেন?"

"বাহার। ব্যালকনিমে।"

"একাই ছিলেন?"

"হাঁ জি। মেওয়ালাল তখন মিউজিয়ামে চরকি দিচ্ছিল।"

মিতিন ঘুরে কিষানলালকে জিজ্ঞেস করল, "রাতে কি এখানে দু'জন গার্ডই থাকে?"

"কাল সোমবার ছিল। আমাদের মিউজিয়াম আর গ্যালারির সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই পাহারাদারিটাও সেদিন একটু ঢিলে থাকে। অন্যদিন উপরে-নীচে দু'জন করে সিকিওরিটি ঘোরে। সোমবারই শুধু একজন।"

"ও। চোর তা হলে আটঘাট বেঁধেই এসেছিল," মিতিন ফের প্রসাদে ফিরল, "যারা আপনাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের দেখলে চিনতে পারবেন?"

"রাতের আন্ধেরায় আচ্ছাসে মালুম হয়নি ম্যাডাম। আর ও লোগ তো প্রথমেই আঁখে পট্টি ডেলে দিল।"

"চেঁচালেন না কেন?"

"বহুত ডর গয়া থা ম্যাডাম। ওরা বলছিল, আওয়াজ করলেই জানে মেরে দেবে।"

"তার মানে, মুখ-হাত-পা বাঁধার সময়ও আপনি আটকাতে পারেননি?"

ঘাড় নামিয়ে দু' দিকে মাথা নাড়লেন প্রসাদ।

মিতিন আবার প্রসাদকে জরিপ করে বলল, "আপনি তো বাড়ির ফ্রন্টে ছিলেন আর ওরা নিশ্চয়ই গাড়িতে এসেছিল! আগে কোনও ইঞ্জিনের আওয়াজ পাননি?"

"নেহি ম্যাডামজি। ও লোগ শায়দ পয়দল..."

"তা হলে তো আপনার সামনে দিয়েই ঢুকেছিল বলতে হয়!"

"নেহি জি। পিছে যাওয়ার আউর ভি রাস্তা আছে। যেখানে সাহেবের সমাধি, ওঁহিসে ভি ওঠা যায়।"

মিতিন কিষানলালের দিকে তাকাল। কিষানলাল সায় দিলেন ঘাড় নেড়ে। বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম। নীচে প্রোফেসর রোয়েরিখের সমাধিক্ষেত্রটি প্রায় অরক্ষিত। ওখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। নানান সময় লোকাল মানুষজন মহর্ষি নিকোলাসের উদ্দেশে ফুল-টুল দিতে যায়। তারা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে না, যেদিক-সেদিক থেকে উপরে উঠে পড়ে। মূলত তাদের কথা ভেবেই ওপাশটা সেভাবে ঘেরা হয়নি।"

"ও," মিতিন ফের প্রসাদকে নিয়ে পড়ল, "ভাইসাব, লোকগুলো আপনাকে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তাই তো?"

"হাঁ জি।"

"আপনার হাত ধরে টেনেছিল? না পা ধরে?"

প্রসাদ যেন এবার থতমত। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছেন।

মিতিন নিচু হয়ে বলল, "স্মরণ করুন, স্মরণ করুন।"

ফ্যাকাসে ঠোঁট নড়েছে প্রসাদের। ঘোর-ঘোর গলায় বললেন, "ইয়াদ নেহি ম্যাডাম। ডরকে মারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।"

"হুঁ," মিতিন সোজা হল, "কৌতূহল মিটেছে মোটামুটি। এবার কি আপনার অফিসে গিয়ে একটু বসতে পারি?"

"শিওর। তার আগে একবার গ্যালারিতে যাবেন নাকি?"

"ওখানে তো শুধু নিকোলাস সাহেবেরই পেন্টিং?"

"ছেলেরও আছে। আই মিন, স্ভেতোস্লাভ সাহেবের। এগারোটা।"

"এখন আবার গ্যালারি খুলবেন? আমার হাজব্যান্ড আর জামাইবাবুরও ছবিগুলো খুব দেখার ইচ্ছে। ওরা মিউজিয়াম থেকে ফিরলে নয়... যদি তখন আপনার অসুবিধে না থাকে।"

"নো প্রবলেম। তা হলে এখন একবার দোতলায় চলুন।"

গিয়ে লাভই হল টুপুরের। উপরতলাটাও কম দর্শনীয় নয়। মূল বাড়ি ঘিরে একটি সম্প্রতি নির্মিত বারান্দা, সেখান থেকে কাচের জানলা দিয়ে দিব্যি দেখা যায় অন্দরটা। এদিকে-ওদিকে রোয়েরিখদের থাকার ঘর, দারুণ সুন্দর-সুন্দর আসবাব, কাঠের তাকে বই, অসংখ্য শো-পিস, পেন্টিং, স্কাল্পচার। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড স্ফটিকও রাখা আছে।

টুপুর আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল, "দেবিকারানিও কি এখানেই থাকতেন?"

"অল্পদিনের জন্য ছিলেন। তারপর উনি আর স্‌ভেতোস্লাভ ব্যাঙ্গালোরে চলে যান, মানে এখনকার বেঙ্গালুরু।"

"কেন?"

"বেঙ্গালুরুতেও রোয়েরিখদের অনেক সম্পত্তি ছিল। ওঁরাই দেখাশোনা করতেন সম্পত্তিটার। বিশাল জমি, আঙুরখেত।"

কথা বলতে-বলতেই নেমেছে তিনজনে। অফিস ঘরে ফিরে কিষানলালের মুখে আবার চিন্তার মেঘ। করুণ স্বরে বললেন, "কী হবে ম্যাডাম? ছবি তিনটে উদ্ধার হবে তো?"

"যদি কালপ্রিটরা ধরা পড়ে!" মিতিন ঠোঁট ওলটাল, "সেটা তো এস পি সাহেবের দায়িত্ব।"

"আপনি তো দেখলেন, কথা বললেন। কী বুঝছেন?"

"প্রচুর ছক-টক কষে লোক দু'টো এগিয়েছে।"

"তা তো বটেই। কিন্তু আপনি তো একজন গোয়েন্দা, আপনি একটু আলাদা করে ব্যাপারটা দেখতে পারেন না?"

"উচিত হবে কী? মিস্টার আশুতোষ শাহ ক্ষুণ্ণ হবেন। চটেও যেতে পারেন।"

"এস পি সাহেবকে জানানোর দরকার কী? তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে তো আপনার একটা সুসম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজন পড়লে তখন না হয়..." কিষানলাল দরজার দিকে ঝলক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, "আসলে কী জানেন ম্যাডাম? পুলিশের উপর আমার তেমন আস্থা নেই। ওরা যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। তাই বলছিলাম।"

"দেখি, আপনাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি।"

"প্লিজ ম্যাডাম। আপনার মুভমেন্ট বলে দিচ্ছে, আপনি কতটা এফিশিয়েন্ট। প্লাস, ঘটনার আগে থেকেই আপনি ব্যাপারটা গেস করেছেন," টেবিলে পড়ে থাকা পাথরের পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করছেন কিষানলাল। স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, "তিন-তিনখানা রোয়েরিখ সাহেবের পেন্টিং! ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কত যে দাম কে জানে! হয়তো পাঁচ কোটি, হয়তো দশ কোটি, হয়তো তার চেয়েও বেশি!"

"কিছু মনে করবেন না মিস্টার দুগ্‌গার, এমন মূল্যবান জিনিসকে আপনারা এত হেলাফেলা করে রেখেছেন কেন? আর একটু টাইট সিকিওরিটির বন্দোবস্ত করা কি উচিত নয়? আরও আশ্চর্যের বিষয়, গ্যালারি থেকে যে কেউ পেন্টিংয়ের ফোটো তুলে নিতে পারে?"

"সে তো ইন্টারনেটেই দেওয়া আছে ম্যাডাম!"

"উঁহু। পেনড্রাইভের ফোটোগুলোর কোয়ালিটি আলাদা। দেখেই বোঝা যায়, অতি উচ্চমানের প্রফেশনাল ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরায় তোলা।"

"হ্যাঁ, সেটা অবশ্য অসম্ভব নয়। তবে পেশাদার ক্যামেরায় ফোটো তোলার অনুমতি কিন্তু আমরা দিই না। ওই পারমিশন দেওয়ার মালিক হিমাচল প্রদেশের সরকার। কিংবা মস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ দা রোয়েরিখস।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। বছরে দু'-চারজনের বেশি ওই ধরনের ক্যামেরা নিয়ে আসেও না। তাদেরও অধিকাংশ বিদেশি।"

"গত এক-দু' বছরে যাঁরা ফোটো তুলে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের তালিকা আপনার কাছে আছে?"

"অবশ্যই। আমি নিয়মিত রেজিস্টার মেনটেন করি।"

"কাইন্ডলি যদি লিস্টটা একটু দেখান।"

"অসুবিধে কী! এ তো গোপনীয় কিছু নয়!"

উঠে বেঁটে আলমারিটা খুলে একটা লম্বা বাঁধানো খাতা নিয়ে এলেন কিষানলাল। মিতিনকে দিয়ে বললেন, "এতেই আছে। সিরিয়ালি।"

শেষ থেকে শুরু করল মিতিন। হঠাৎই চোখের মণি স্থির। পরক্ষণে দৃষ্টি স্বাভাবিক। রেজিস্টার ফেরত দিল কিষানলালকে। আলমারিতে খাতাখানা তুলছেন কিষানলাল, ফের আশুতোষ শাহর আবির্ভাব। গমগমে গলায় বললেন, "আপনি এখনও যাননি?"

মিতিন হেসে বলল, "আমার টিম উপরের মিউজিয়ামে। তারা ফিরলেই..."

"এবার কোথায় প্ল্যান? মানালি?"

"তেমনই তো ইচ্ছে।"

"যান, এনজয় দা টুর। এদিকে আমি ততক্ষণ দুই ওস্তাদকে তাড়া করি। স্ট্র্যাটেজি রেডি। বন্দোবস্তও কমপ্লিট। শুধু প্রাইভেট গাড়ি নয়, কুলু থেকে বেরনোর বাস, ট্রাক, সব চেক করতে বলেছি," আশুতোষ ঘড়ি দেখলেন, "যাই, এবার কুলু যাত্রা করি। ওই বৈজনাথ রাইকে ঝটপট কব্‌জা করতে হবে। নইলে তিনি আবার কখন উধাও হয়ে যান!"

"একটা সাজেশন রাখব এস পি সাহেব?"

"বলুন?"

"বৈজনাথজি ভাল পোর্ট্রেট আঁকেন। যদি তাঁকে দিয়ে লোক দু'টোর স্কেচ করিয়ে নেন।"

"ওটা তো ঘাড় ধরে করাব," আশুতোষ চোখ তেরচা করলেন, "তবে বৈজনাথের স্কেচের উপর কি পুরোপুরি নির্ভর করা যায়? তিনি যদি নিজেই অপকর্মে যুক্ত থাকেন, তা হলে তো ভুলভাল ছবি এঁকে আমাদের মিসগাইডও করতে পারেন।"

"না, মিস্টার শাহ, বৈজনাথজি বোধ হয় অতটা খারাপ লোক নন। কথা বললেই বুঝবেন।"

"এটা কি ডিটেকটিভের সার্টিফিকেট?"

"ধরুন তাই," মিতিন মৃদু হাসল, "আর একটা কথাও বলতে পারি। প্রসাদ নামক পাহারাদারটিকে আর একবার কড়া করে জেরা করুন। হয়তো আরও কিছু তথ্য পাবেন।"

"বলছেন? তা হলে ব্যাটাকে তুলেই নিয়ে যাই?"

"আর জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট। আপনার মোবাইল নম্বরটা যদি দেন।"

"লিখে নিন।"

মোবাইলে নম্বরটা তুলছিল মিতিন, তিরবেগে ঘরে বুমবুমের প্রবেশ। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "কী গো মা, চলো। আর কতক্ষণ এখানে থাকবে?"

আলতো করে ছেলের চুল ঘেঁটে দিল মিতিন, "তোদের ঘোরাঘুরি কমপ্লিট? এবার খিদে পেয়েছে, অ্যাঁ?" খিদে শব্দটা বুঝি নাড়িয়ে দিল টুপুরকে। উত্তেজনায় টের পায়নি এতক্ষণ, সত্যিই পেট চুঁইচুঁই করছে।

॥ ৭ ॥

"সে কী রে! আমরা মানালি যাচ্ছি না?"

"তাই বললাম নাকি? হাতে তো এখনও অঢেল দিন, পরে যাব। বেড়াতে বেরিয়ে শুধু হুটোপুটি করে ছোটাটা তো কোনও কাজের কথা নয়। নগ্গরে যখন এলামই, একটা রাত কাটাতে দোষ কী! দেখতেই তো পাচ্ছ, জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর। আজ চতুর্দশী, চাঁদের আলোয় আরও অপূর্ব লাগবে।"

"আমি মিতিনের দলে। এক রাত কেন, তিন রাত্তিরও এখানে থাকতে পারি। আদৌ মানালি না গেলেই বা কী এসে যায়! মানালিও পাহাড়, নগ্গরও তাই। ওখানে থেকেও বরফে ঢাকা হিমালয় দেখবে, এখান থেকেও।"

"অ্যাই, তুমি চুপ করো তো, শুধু আয়েশ করার ধান্দা।"

"বটেই তো। ছুটি কাটাতেই তো এসেছি। আরাম করব না কেন!"

সহেলি আর অবনীতে ফের ঝগড়া বেধে যাচ্ছিল, পার্থ থামিয়েছে হাত তুলে। হেসে সহেলিকে বলল, "দেখাই যাক না দিদি, যদি এখানে একটা ভাল হোটেল পাওয়া যায়। বিকেলে নয় কাস্‌লটা ঘুরে আসব।"

অবনী ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ, ওখানে আর একটা মিউজিয়ামও আছে।"

"আমি আর মিউজিয়ামে নেই। একটা দেখেই আমার ঠ্যাং ব্যথা করছে।"

"তুমি লোকাল মার্কেটে যেয়ো। দরাদরি করে মেমেন্টো কেনো।"

বিচিত্র মুখভঙ্গি করলেন সহেলি। দেখে সকলে হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতেই আবার দুপুরের আহারে মন দিয়েছে। নগ্গরের এই ভোজনালয়টি একান্তই নিরামিষ। খাবার-দাবারের পদও খুব বেশি নেই। ফুলকপির একটা ঝাল-ঝাল তরকারি, বেগুন ভর্তা আর তড়কা ডাল। গরমাগরম পরোটার সঙ্গে তাই হাপুসহুপুস খাচ্ছে সকলে। এমনকী, ঝালের কষ্ট ভুলে বুমবুমও। পেটে যখন ছুঁচো ডন দেয়, তখন সব খাবারই তো অমৃত।

টিঙ্কুও খাচ্ছিল পাশের টেবিলে। পরোটা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে পার্থ তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে পছন্দসই হোটেল কোথায় আছে, জানো?"

"বহুত মিলেগা। উপরের কাস্‌লেই থাকতে পারেন, ওখানে তো এখন হোটেল হয়ে গিয়েছে।"

"ভাল?"

"বহুত বড়িয়া। লেকিন বহুত মেহেঙ্গা।"

"মাঝামাঝি কিছু নেই?"

"পেয়ে যাবেন। এই বাজারেই ঢুঁড়লে।"

"হোটেল থেকে হিমালয়ের চুড়ো দেখা যাবে তো?"

"জরুর।"

খাওয়া সেরে টিঙ্কুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পার্থ। বিল মেটাতে গিয়ে মিতিন আলাপ জুড়েছে হিমাচলি হোটেলমালিকের সঙ্গে। মৌরি চিবোতে-চিবোতে প্রশ্ন করল, "এখন তো নগ্গরের পিক সিজন, তাই না?"

"কোথায় আর মরশুম ম্যাডাম! নগ্গরে তো তেমন টুরিস্টই আসে না।"

"কেন? এখানে তো অনেক কিছু দ্রষ্টব্য আছে? রোয়েরিখ সাহেবের গ্যালারি!"

"পাহাড় বেড়াতে এসে কত জন আর তসবির পসন্দ করে বলুন। সকলে তো কুলু-মানালি ছোটে। হয় কিছু বিদেশি আসে, নয় দু'-চারটে খ্যাপা মানুষ।"

"খ্যাপা?"

"নয়তো কী! পিঠে বোঝা চাপিয়ে এ-পাহাড় ও-পাহাড় চরে বেড়াচ্ছে।"

"ও, আপনি ট্রেকারদের কথা বলছেন?"

"হাঁ জি। ওরাই সব থেকে বেশি আসে। নগ্গর থেকে অনেক স্পটে যাওয়া যায় কিনা।"

"যেমন?"

"চন্দ্রখনি পাস যেতে পারেন। মালানা গ্রাম যদি পায়ে হেঁটে যান, তিন দিন লাগবে। চাইলে মালানা দিয়ে মণিকরণ যাওয়া যায়, পথে পড়বে রসোই পাস। আবার মণিকরণ পেরিয়ে ক্ষীরগঙ্গা যেতে পারেন। সব ক'টাই খুব ফেমাস ট্রেকিং রুট," বলতে-বলতে ভদ্রলোক একবার মিতিনদের দলটাকে দেখে নিলেন। হেসে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই ট্রেক করতে আসেননি?"

"একেবারেই নয়। আমরা ছবি দেখার পার্টি।"

"ঢুকতে দিল? ওখানে তো আজ অনেক পুলিশ। রাতে নাকি চোর-টোর এসেছিল!"

"আপনি জানেন?"

"ছোট জায়গা ম্যাডাম, খবর কানে এসেই যায়। তবে একটা কথা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ম্যাডাম। এই পাহাড়ের লোকেরা কেউ রোয়েরিখ সাহেবের গ্যালারিতে চুরি করতে যাবে না। সবাই এখনও ওঁকে ভক্তি করে।"

"চোর তা হলে বাইরের কেউ?"

"বিলকুল।"

"তা বাইরের লোক রাতদুপুরে এসে চুরি করবেই বা কী করে? অত রাতে পালাবেই বা কোথায়?"

"কে জানে! হয়তো পয়দল চন্দ্রখনি পাসের দিকে চলে গেল। কিংবা এখান থেকে কাতরেইন যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, পথে বিপাশা পড়ে। নদী টপকালেই পাতলিখুল, তারপর কাতরেইন আর কতটুকু!"

পার্থ ফিরেছে। এসেই মিতিনকে তাড়া লাগাতে শুরু করল, "চলো-চলো, হোটেলরুমে আগে বডি ফেলি। তারপর বেরিয়ে যার সঙ্গে খুশি বকর-বকর কোরো।"

হোটেলটা কাছেই। বাজার পেরিয়ে ছোট্ট টিলার মাথায়। পিছনে উত্তর দিক পুরো খোলা এবং সত্যি-সত্যি সেখান দিয়ে বরফে ঢাকা হিমালয়ের একটা ফালি দৃশ্যমান। ঘর দু'খানাও চলনসই। কুলুর কটেজের মতো বাহারি না হলেও খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, ওয়ার্ড্রোব, সবই আছে। একটা করে ছোট টিভিও।

বিছানা পেয়ে সহেলির হাঁটু-কোমরের ব্যথা যেন বেড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে শুয়ে পড়েছেন। অবনী বসলেন বই খুলে। বুমবুম যথারীতি টিভিতে।

টুপুরের চোখ জড়িয়ে আসছিল। ঘুম কাটাতে পাশের কামরায় এল। এ ঘরেও পার্থ টিভি খুলবে-খুলবে করছে। হাতে রিমোট। টুপুরকে দেখে বলল, "কী রে, মাসির ল্যাজ, এবার তোদের কী প্ল্যান?"

মিতিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। টুপুরের হয়ে জবাব দিল, "আপাতত নগ্গর দর্শন।"

"নো টুপি প্লিজ। খোলসা করে বলো তো, কেন রয়ে গেলে নগ্গরে?"

"বুঝতে পারছ না? চুরির কিনারা করতে গেলে এই নগ্গরে একটু থাকা দরকার। অর্থাৎ কিনা অকুস্থল থেকে খুব একটা দূরে যাওয়া সমীচীন নয়।"

"কোমর বেঁধে নেমেই পড়লে তা হলে?"

"ছাড়তে পারছি না যে। পরপর এমন সব ক্লু এসে যাচ্ছে!"

"যেমন?"

"সেই পেনড্রাইভ থেকে তো শুরু হয়েছে। তারপর বৈজনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ছবি কপি, ছবি চুরি..."

"তো?"

"আরও আছে। এখনই ভাঙছি না।"

"যা ইচ্ছে করো। শুধু মাথায় রেখো, এ কেসে তোমার কিন্তু এক পয়সাও রোজগার নেই।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় অর্থ ছাড়াও কেস করে স্যার। মগজের খিদে মেটানোর বাসনাও তো থাকে মানুষের, নয় কি?"

পার্থ লাগসই একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ বুমবুম হাজির। তিড়িংবিড়িং লাফাতে-লাফাতে বলল, "টিভিতে ছবি চুরির খবরটা দেখাচ্ছে গো মা!"

চোখ সরু করে পার্থ বলল, "তুই কী করে জানলি?"

"চ্যানেল চেঞ্জ করতে গিয়ে চোখে পড়ল। চালাও না টিভি, দ্যাখো।"

হ্যাঁ, বুমবুমের সংবাদ সঠিক। স্থানীয় চ্যানেলে এক মহিলা গম্ভীর মুখে পরিবেশন করছেন ছবি চুরির এপিসোড। নবীন তারকুণ্ডে আর সুখদেব ভাটিয়া নামে দুই ব্যক্তি নাকি সম্ভাব্য চোর। গোটা উপত্যকা জুড়ে খোঁজ চলছে ওই দুই ব্যক্তির। তল্লাশি করা হচ্ছে মান্ডিগামী এবং রোটাংগামী প্রতিটি যানবাহন। লোক দু'টোর সন্ধান দিতে পারলে হিমাচল প্রদেশ সরকার পুরস্কার প্রদান করবে বলেও ঘোষণা করা হল।

টুপুর তারিফের সুরে বলল, "এস পি সাহেব দারুণ প্রম্প্‌ট তো!"

পার্থ অবজ্ঞাভরে বলল, "কিন্তু ব্রেনে ঘিলুটা একটু কম।"

"কেন?"

"চুরির বিষয়টা জানানোই তো কাফি ছিল। সঙ্গে বড় জোর লোক দু'টোর নাম আর অ্যাওয়ার্ড, ব্যস। পুলিশ কী অ্যাকশন নিচ্ছে, তা সর্বত্র চাউর করা তো বোকামি।"

"চোর সাবধান হয়ে যাবে বলছ?"

"অফ কোর্স। তারা আর গাড়িঘোড়া ধরবেই না। অন্য কোনও উপায়ে পালানোর তাল করবে।"

"কীভাবে? পায়ে হেঁটে? নাকি উড়ে? আকাশপথে? জানো কি, দুপুর বারোটার পরে কুলু থেকে আর কোনও প্লেন ছাড়ে না?"

"জানার প্রয়োজন নেই। তবে কাজটা যে উচিত হয়নি, এ আমি জোর গলায় বলব।"

"আমার কিন্তু উলটোটাই মনে হয়," এবার মিতিনের ঠোঁট নড়েছে, "অ্যানাউন্সমেন্টে হয়তো সুফলই মিলবে।"

"কী রকম?"

"লোক দু'টো যদি টিভি দেখে, আমার ধারণা, দেখবেই, তা হলে তাদের দু' তরফা বিপদ। ঘাপটি মেরে থাকতেও ভয় পাবে, দুম করে বেরিয়ে পড়ারও সাহস হবে না। এরকম মুহূর্তেই অপরাধীরা ভুলভাল কাজ করে বসে।"

"সবটাই কিন্তু নির্ভর করছে একটা অনুমানের উপর," টুপুর টুপুস মন্তব্য জুড়ল, "আমরা ধরেই নিচ্ছি, লোক দু'টো এখনও কুলু ভ্যালিতে আছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা হয়তো বহু আগেই পগার পার।"

"অসম্ভব। কুলুর আশপাশে দুই মক্কেলকে থাকতেই হবে।"

"কেন?"

"সে আর একটা অঙ্ক। আমি অলরেডি কষে রেখেছি," মিতিন ঠোঁট চেপে হাসল, "দাঁড়া, আশুতোষ শাহকে একটা ফোন লাগাই।"

মোবাইলে নম্বর খুঁজে টিপল মিতিন। ইচ্ছে করেই বুঝি মাইক্রোফোন অন করল, যাতে পার্থ, টুপুর শুনতে পায়।

বারকয়েক রিং বাজার পর ওপারে আশুতোষের মার্জিত কণ্ঠস্বর, "ইয়েস ম্যাডাম? পৌঁছে গিয়েছেন মানালি?"

"না মিস্টার শাহ। আজ আমরা নগ্গরে থাকাটাই মনস্থ করলাম," মিতিনের মুখ হাসি-হাসি, "হোটেলে এন্ট্রি নিয়েই আপনার কর্মকুশলতা দেখছি। টিভিতে জোর প্রচার চলছে তো!"

"হা হা। আমি আরও অনেক দূর এগিয়েছি। বৈজনাথ রাই এখন আমার সামনে। লোক দু'টোর স্কেচ বানাচ্ছেন।"

"দ্যাটস গ্রেট! কেমন বুঝলেন বৈজনাথকে?"

"সম্ভবত ইনোসেন্ট। বাট নো প্র্যাকটিক্যাল সেন্স। শিল্পীরা যেমন হয় আর কী," আশুতোষ অল্প থেমে থেকে বললেন, "কেসে আর একটা ব্রেক থ্রু হয়েছে ম্যাডাম। পাজি দু'টো যে গাড়িতে কুলু থেকে বেরিয়েছিল, সেই মারুতি ভ্যানটিকে ট্রেস করা গিয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"ওরা কুলু ছেড়ে সোজা মানালি গিয়েছিল। সেখানে উঠেছিল মানালসু নদীর ধারে একটি গেস্টহাউসে। নাম, দা গোল্ডেন মুন।"

"জানলেন কী করে?"

"আরে, গাড়ির ড্রাইভার তো আমাদের জিম্মায়। মানালি থানায় জবানবন্দি দিয়েছে। তার বক্তব্য, লোক দু'টো নাকি গেস্টহাউসে উঠেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। লোকটার স্টেটমেন্টও আমি ক্রসচেক করে নিয়েছি গোল্ডেন মুনে টেলিফোন করে। ওখানকার ম্যানেজারই জানাল, গেস্টহাউসে ওরা নাকি মোটে একটা দিন ছিল। সোমবার দুপুরে লাঞ্চ সেরে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়।"

"অন্য কোনও গাড়ি নিয়ে?"

"না। গাড়ি ছাড়াই। সঙ্গে নাকি বিশেষ মালপত্র ছিল না। জাস্ট দু'জনের দু'টো হ্যাভারস্যাক আর দু'টো হ্যান্ড-লাগেজ। এবার আমি পতা লাগাচ্ছি, ওরা মানালি থেকে অন্য কোনও গাড়ি নিয়েছিল কিনা।"

"চমৎকার! আপনি তো ঝড়ের গতিতে ছুটছেন!"

"হা হা হা।"

"চালিয়ে যান। গ্যালারির পাহারাদার প্রসাদের কী সমাচার?"

"কাস্টডিতে এনেছি। কুলুতে। বৈজনাথের স্কেচ আঁকা শেষ হোক, তারপর প্রসাদকে নিয়ে পড়ছি।"

"ছাড়ি তা হলে। মাঝে-মাঝে ফোনে বিরক্ত করব কিন্তু।"

"আরে না। আপনি হলেন গিয়ে ডিটেকটিভ। মাঝে-মাঝে আপনার কাছ থেকেও তো ইনপুট পেতে পারি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

টেলিফোনটা অফ করে একটুক্ষণ চোখ বুজে রইল মিতিন। ফের মোবাইলে আর একটা নম্বর টিপছে। আবার মাইক্রোফোন চালু। এবার অপর প্রান্তে বিভব শর্মা। হাউমাউ করছেন, "আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল ম্যাডাম!"

মিতিন নির্বিকার, "কেন? কী হল?"

"আপনি কেন এস পি সাহেবকে আমার নাম্বার দিলেন ম্যাডাম? উনি তো আমাকে বহুত আঁখ দেখাচ্ছেন। প্রাইভেট কটেজ চালাই, পুলিশ নজর দিলে বেওসা চালাব কী করে? কাঁহা-কাঁহাসে গেস্ট আসে আমার কটেজে, তাদের কে যে কেমন আমি কী ভাবে জানব?"

"তা তো বটেই।"

"কিন্তু এস পি সাহেব তো ও কথা মানছেন না। রোয়েরিখ গ্যালারিতে কোনও পেন্টিং চুরি হয়েছে, ওই তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া নাকি কালপ্রিট। তা এতে আমার কী কসুর বলুন? অথচ এস পি সাহেব আমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে চাইছেন। বিজনেস তো আমার চৌপাট হয়ে যাবে।"

"আহা, লোক দু'টো ধরা পড়লেই তো আপনি..."

"পুলিশ কি আসলি ক্রিমিনালকে ধরতে পারে কখনও? তারা কোথায় ভেগেছে কৌন জানে! মাঝখান থেকে আমি ফালতু-ফালতু..." বিভব শর্মার স্বরে তীব্র ক্ষোভ, "টাইমটাই আমার খারাপ যাচ্ছে। এমন একটা ভরা মরশুমে আমার কটেজ বিলকুল খালি!"

"দুঃখ করছেন কেন? কালই তো একজন আসছেন!"

"না ম্যাডাম। ওতেও গড়বড়। এই তো দুপুরে সাহেবের মেসেজ এল, ভিসা নিয়ে কী প্রবলেম বেধেছে, একদিন পর উনি দিল্লিতে নামছেন। অতএব কাল নয়, উনি কুলু আসবেন পরশু। ভাবুন, অলরেডি বুকিং ফিরিয়ে দিয়েছি, এখন কালও হোল-ডে যদি ফাঁকা যায়..."

"আফশোস করবেন না শর্মাজি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপনি প্লিজ এস পি সাহেবকে একটু বলে দিন, আমি বুরা আদমি নই।"

"কী আশ্চর্য! আমি বললেই বা তিনি মানবেন কেন?"

"এস পি সাহেবের মুখে সব শুনেছি ম্যাডাম। আপনার পরিচয়, পেশা ..। মনে হল, উনি আপনার কথাকে ওজন দেবেন," বিভব শর্মা ক্ষণিক চুপ থেকে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আমার এই অপদস্থ হওয়ার পিছনে আপনারও কিছুটা দায়িত্ব আছে।"

"কীভাবে?"

"রুমে যে একটা পেনড্রাইভ পেয়েছিলেন, সেটা কি আমায় জানানো উচিত ছিল না? আমি তো ওটাকে থানায় জমা করতাম।"

"করতেন কী?"

"চান্সই তো পেলাম না। নিজেকে প্রমাণ করব কী করে!"

আর কথা না বাড়িয়ে মিতিন কুট করে লাইনটা কেটে দিল। পার্থ, টুপুর মন দিয়ে শুনছিল ফোনালাপ, ব্যঙ্গের সুরে পার্থ বলল, "শর্মা একটু বেশি ঘ্যানঘ্যান করছেন না?"

"যা বলেছ," টুপুর সায় দিল, "পেনড্রাইভ হাতে পাননি বলে কেন এত হাহুতাশ? তারকুণ্ডেদের সঙ্গে ওঁর যোগসাজশ থাকা মোটেই বিচিত্র নয় মিতিনমাসি।"

"বিভব শর্মাকে একদম ভিলেন ঠাউরে ফেললি?" মিতিন দু' দিকে

মাথা নাড়ল, "না রে, লোকটার একটাই গলদ। বড্ড লোভী। হয়তো তার জন্যই ওকে আরও সাফার করতে হবে।"

শেষ বাক্যটি পুরোপুরি বোধগম্য হল না টুপুরের। আর কী দুর্ভোগ থাকতে পারে বিভব শর্মার?

॥ ৮ ॥

নগ্গরে আঁধার নেমেছে বহুক্ষণ। কুলুর মতো জমজমাট নয় নগ্গর, বরং সন্ধে হতেই চতুর্দিকে যেন কেমন ঘুম-ঘুম ভাব। অল্পস্বল্প দু'-চারজন টুরিস্ট ঘুরছে ইতস্তত, সবই প্রায় শ্বেতাঙ্গ। বাজারে দোকানপাটেরও ঝাঁপ পড়ে গেল ঝপাঝপ। দূরে, খাড়া উত্তরে, এক পাহাড়ে টিপটিপ আলো। ওই জায়গাটার নাম নাকি জগৎসুখ। একদা ওখানেই নাকি রাজধানী ছিল কুলুরাজ্যের। নগ্গরেরও আগে।

গায়ে শাল জড়িয়ে হোটেলের কাচঘেরা বারান্দা থেকে পাহাড়টাকে দেখছিল টুপুর বিরস মেজাজে। বিকেল থেকে সময়টা আজ বিচ্ছিরি কাটছে। টুপুরদের হোটেলে বসিয়ে রেখে কোথায় যে গায়েব হল মিতিনমাসি, এখনও তার পাত্তা নেই। গাড়িটাও নেয়নি, অর্থাৎ কাছেপিঠে আছে নির্ঘাত। আবার বোধ হয় গ্যালারিতেই গিয়েছে, একে-ওকে-তাকে জেরা করছে। অথবা চুরির জায়গাতেই অনুসন্ধান চালাচ্ছে নতুন করে। টুপুরকে ছাড়াই। কোনও মানে হয়? মাঝখান থেকে টুপুরকে কিনা বেরোতে হল বাবা-মা-পার্থমেসোদের সঙ্গে। বড্ড নীরস ঘোরাঘুরি। বাবা তো সারাক্ষণ উরুসবতী মিউজিয়ামের গল্প শুনিয়ে গেলেন টুপুরকে। ওখানে নাকি শুধু শিল্পকলা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাও চলে। হিমালয়ের গাছপালা আর শিকড়বাকড় থেকে এক সময় যে ওষুধ-বিষুধ তৈরি হত, তা নিয়ে নানা পরীক্ষা, বায়োকেমিস্ট্রি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান...। চমৎকার একখানা লাইব্রেরিও আছে নাকি সেখানে। পার্থমেসো তো আরও একপ্রস্থ গল্পের ঝাঁপি। ব্রিটিশরা নাকি কুলু উপত্যকার দখল নিয়েছিল মাত্র পৌনে দু'শো বছর আগে। তারও পরে নগ্গরে অনেকটা জমিজমা কেনেন এক ব্রিটিশ কর্নেল। নাম রেনিক। তাঁর হাতেই নাকি কুলুতে আপেল চাষের শুরু। রোয়েরিখ সাহেবের বাড়ি-টাড়ি নাকি সেই কর্নেল সাহেবেরই বানানো। এক সময় মান্ডিরাজাকে সব বেচেবুচে দিয়ে রেনিক ইউরোপ চলে যান। রাজা বাড়িঘর দেখভাল করার ভার দেন আর এক সাহেবকে। তা সাহেবের কপাল মন্দ। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নাকি একই দিনে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মারা যান। তারও পরে আসেন রোয়েরিখরা। মান্ডিরাজার কাছ থেকে বাড়িঘর সমেত গোটা সম্পত্তিটা কিনে ফেলেন এবং ধীরে-ধীরে তাঁরা কুলুরই মানুষ বনে যান।

কিন্তু এত সব জেনে টুপুরের কী লাভ? মিতিনমাসি বলে, "হাবিজাবি তথ্য ঢুকিয়ে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিস না। তাতে দরকারের সময়ে আসল বিষয়টি খুঁজতে অসুবিধে হবে। রোয়েরিখদের বাড়ির ইতিহাস জেনে কি চোর ধরার ক্লু মিলবে? ফুঃ।"

নগ্গরের চূড়ায় রাজা জগৎ সিংহের দুর্গ-কাম-প্রাসাদটা অবশ্য মন্দ লাগেনি টুপুরের। পাথরের দুর্গটায় পা রাখলেই কেমন গা ছমছম করে। প্রাসাদ থেকে নীচের উপত্যকার দৃশ্যও ভারী মায়াময়। আজ বিকেলে ওটুকুই যা টুপুরের প্রাপ্তি।

তারপর থেকে তো হোটেলে ফিরে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে থাকা। বাইরে নেমে যে একটু হাঁটবে টুপুর, তারও কি জো আছে? একে কনকনে ঠান্ডা, তায় শনশন হাওয়া! ভালই বেগ আছে বাতাসের, ছুরির মতো কেটে-কেটে লাগে গায়ে। বোঝাই যায়, নগ্গর কুলুর চেয়ে অনেকটা উঁচুতে।

ভিতর থেকে হঠাৎ পার্থ ডাকছে, "অ্যাই টুপুর! টুপুর!"

টুপুর অনিচ্ছাভরে সাড়া দিল।

"দেখে যা, কী আনিয়েছি। ঠান্ডা হয়ে যাবে, আয় চটপট।"

রুমে ফিরে মুখচোখ সামান্য উজ্জ্বল হল টুপুরের। প্রকাণ্ড প্লেটে রাশিখানেক পেঁয়াজি আর আলুর চপ। মা খেতে আরম্ভ করেছেন, বুমবুম তুলব-তুলব করছে, পার্থমেসোর মুখ চলছে কচকচ। একটা পেঁয়াজি তুলে কামড় দিল টুপুর। বসেছে সহেলির পাশে। ভুরু নাচিয়ে বলল, "এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এমন মুখরোচক খাদ্যবস্তু মিলল কোত্থেকে?"

বইয়ে নিমগ্ন ছিলেন অবনী। তবু ঠিক শুনতে পেয়েছেন। ভারিক্কি গলায় বললেন, "পাণ্ডবরা এই অঞ্চল এড়িয়ে গিয়েছেন, তাই বা বলি কী করে? লোকাল হিস্ট্রি অনুযায়ী মানালির জঙ্গলে হিড়িম্ব রাক্ষসকে মেরে তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন ভীম। শুধু তাই নয়, মহাভারতের এক কাঁড়ি ঋষি এই লোকালিটিতে থাকতেন। এমনকী মহাভারতের লেখক বেদব্যাসও। ইনফ্যাক্ট, বিপাশা নদীর নামও..."

"আমি শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই না," সহেলি দু' কান চাপলেন, "জ্ঞান বিতরণ থামিয়ে এবার আলুর চপ খাও তো।"

"খেপেছ? আপেলের দেশে এসে ওই সব কুখাদ্য গিলব? একে ভাজাভুজি, তায় কী তেল তার ঠিক নেই!"

"উহুঁ। মেটিরিয়াল তেমন খারাপ নয়," পার্থ অবনীকে আশ্বস্ত করতে চাইল, "আমি এই হোটেলের রন্ধনশালায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়েছি দাদা।"

টুপুর তামাশা জুড়ল, "তোমার তো হেভি ক্যালি!"

"অবশ্যই। রাতে কী মেনুর বন্দোবস্ত করলাম জানিস তো?"

"কী?"

"কষা মুরগি, হাতে গড়া রুটি, পাঁপড়, চাটনি, আচার। ব্রয়লার নয়, বিশুদ্ধ কুলু চিকেন।"

টুপুর উল্লাসধ্বনি করতে যাচ্ছিল, তখনই মঞ্চে মিতিন। ঘরে ঢুকেই হালকা সুরে বলল, "বাহ, দিব্যি সাঁটাচ্ছ তো তোমরা!"

প্রায় চেঁচিয়ে উঠে টুপুর বলল, "ছিলে কোথায় এতক্ষণ?"

"বলছি-বলছি। আগে পেটে একটু দানাপানি পুরি। প্রচুর হেঁটেছি, হাই ডোজের ক্যালরি চাই এখন।"

কাঁধের ব্যাগ টেবিলে রেখে নির্বিকার মুখে চপ খাচ্ছে মিতিন। তর সইছিল না টুপুরের, ছটফট করছে। ফের বলল, "কোথায় গিয়েছিলে, জানাতে আপত্তি আছে নাকি?"

"আদৌ না," মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "এখানেই এদিক-ওদিক করছিলাম। দু'-চারজনের সঙ্গে কথাও বলতে হল।"

"অভিযানটা কি খুবই গোপনীয়?"

"সঙ্গে নিইনি বলে বড় চটে আছিস দেখছি। ওরে বোকা, কোথাও-কোথাও আমায় একাই ছুটতে হয়। ওতে মুভমেন্টটা ইচ্ছেমতো করা যায় রে।"

পার্থ বলল, "ভাঁজ না মেরে পয়েন্টে এসো। পাক্কা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কোন রাজকার্যে ছিলে, অ্যাঁ?"

"একের পর-এক সূত্র জোগাড় করলাম। এবার তাদের জোড়া লাগাব।"

"যেমন?"

"বিশদেই বলি তা হলে। অবনীদা, বোর হবেন না কিন্তু," মিতিন গুছিয়ে বসল, "দুপুর থেকে আমায় একটা প্রশ্ন তাড়া করছিল। লোক দু'টো কীভাবে পরপর স্টেপ ফেলেছে? কুলু থেকে মানালি পৌঁছে তারা তো গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপর কী করল? তারপর কী করল?"

"ভেবে কিছু পেলে?"

"একটা আউটলাইন খাড়া করলাম। আমার যুক্তি বলল, লোক দু'টো নিশ্চয়ই আর গাড়িভাড়া করবে না। কারণ, ড্রাইভারসহ গাড়ি সব সময়ই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে থেকে যাবে। অতএব তারা নগ্গর আসার জন্য মানালি থেকে নির্ঘাত বাস ধরেছে। মানালি থেকে নগ্গরে লাস্ট বাস আসে রাত আটটায়।"

টুপুর বলল, "তারকুণ্ডেরা আটটার সময় নগ্গরে পৌঁছে গিয়েছিল?"

"সম্ভবত।"

"কিন্তু চুরি তো হয়েছে গভীর রাতে! সেই দু'টো-তিনটেয়!"

"কারেক্ট। এই ছ'-সাত ঘণ্টা তারা তা হলে ছিল কোনখানে? নগ্গরের পথে-পথে তো নিশ্চয়ই ঘোরেনি! অথচ তারা নগ্গরেই ছিল! কীভাবে তা সম্ভব?"

"তুমিই বলো।"

"তারা যদি এমন কোনও ভেক ধরে, যাতে লোকজনের চোখে পড়লেও সন্দেহ না জাগে! এক্ষেত্রে ট্রেকার সাজা সবচেয়ে সোজা। পিঠে একটা হ্যাভারস্যাক থাকলেই যথেষ্ট। সঙ্গে টুপি, গ্লাভস, লাঠি। হ্যাভারস্যাকে ট্রেকিংয়ের সরঞ্জাম আছে, না ডাকাতির, তা কে আর বুঝছে!"

"তেমন কোনও ছদ্মবেশীর সন্ধান পেলে?"

"নিখুঁত ভাবে কেউ বলতে পারল না। তবে এখানে একটা ধাবা সাড়ে দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখানে দু'জন শিখ নাকি আহার সেরেছিল এবং তাদের পোশাক-আশাক দেখে ট্রেকারই মনে হচ্ছিল।"

"তারকুণ্ডেরা সর্দারজি সেজেছিল?"

"হ্যাঁ। এনকোয়্যারির পরের ধাপে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।"

"কী রকম?"

"আসছি সে প্রসঙ্গে। ধাপে-ধাপে," মিতিন আর একখানা পেঁয়াজি তুলল প্লেট থেকে। চিবোতে-চিবোতে বলল, "রাতের খাওয়া সেরে তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া পাড়ি জমাল গ্যালারিতে। সামনে দিয়ে ঢুকল না, নীচের সমাধিস্থল থেকে উঠে এল উপরে, বাড়ির পিছনে। সিকিওরিটি গার্ড প্রসাদকে ওরা আগেই হাত করে রেখেছিল।"

"কেমন করে শিওর হলে?"

"কারণ, টেনেহিঁচড়ে ঝোপ অবধি নিয়ে যাওয়ার গল্পটা বানানো। যেখানে প্রসাদ পড়েছিল, তার আশপাশে এমন কোনও চিহ্ন পাইনি, যা দেখে মনে হয় লোকটাকে হিঁচড়াতে-হিঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ, লোকটা কিন্তু খাদের ধারে ছিল, অথচ খাদে পড়েনি! অর্থাৎ হাত-মুখ বাঁধার ঘটনাটা পুরো সাজানো। ঝোপে তাকে রাখাও হয়েছে সাবধানে," মিতিন সামান্য দম নিয়ে ফের বলল, "তবে হ্যাঁ, প্রসাদ কিন্তু নাটকটার জন্য সাংঘাতিক কিছু পয়সাকড়ি পায়নি। হয়তো দু'-চারশো, বা বড়জোর হাজার। এবং যে ছবিগুলো বদল হতে চলেছে, তাদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে প্রসাদের এখনও কোনও আন্দাজ নেই।"

"বুঝলাম। লোকটা বোকা পাপী।"

"কতকটা তাই। এ ছাড়া লোকটাকে তারকুণ্ডেরা ভয় দেখিয়েও থাকতে পারে। হয়তো প্রসাদ ভেবেছে, বাধা দিলেও তো প্রাণের আশঙ্কা, তার চেয়ে বরং ক'টা টাকা নিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নয় পড়েই থাকি। আমার বিশ্বাস, পুলিশের রুলের গুঁতোয় তার মুখ থেকে সত্যিটা এতক্ষণে বেরিয়েও গিয়েছে।"

"মিস্টার শাহকে ফোন করে তা হলে জেনে নাও।"

"কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, এই ডিডাকশানের ভুল-ঠিকে কিছু যায় আসে না," মিতিন মৃদু হাসল, "এবার আমি পরের ধাপে। চুরির পর তারকুণ্ডেরা গেল কোথায়?"

পার্থ বিজ্ঞের সুরে বলল, "নগ্গর-কুলুর ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাবে, এটাই স্বাভাবিক।"

"হ্যাঁ। যদি তারা নিজেদের জন্য চুরি করে। আই মিন, তারা নিজেরা যদি ছবি তিনটে বেচার প্ল্যান করে থাকে।"

"নিজেরাও সংগ্রহে রাখতে পারে।"

"নো চান্স। ওই ছবি যারা কালেকশানে রাখে, তারা মারুতিভ্যান ভাড়া করে না। তারা অনেক রইস হয়।"

"ওরা তো কুলুতে রইসি চালেই ছিল!"

"কারণ, তাদের কেউ একজন ওভাবে থাকতে বলেছিল। ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে। নির্জনে। এবং বিভব শর্মারই কটেজে।"

"কেন? কেন? কেন?"

"সব কেনর জবাব এক্ষুনি মিলবে না স্যার। শুধু এটুকু জেনে রাখো, এত দামি ছবি ছুটকো-ছাটকা ক্রিমিনালরা মার্কেটে বেচতে পারে না।"

"কেন পারে না?"

"কারণ, তাদের সেই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। যারা এই ধরনের ছবি কেনে, ওরা নিয়ে গেলে ছবিগুলোকে আসল বলে মানবেই না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে নামীদামি পেন্টারের অরিজিনাল ছবি কেনাবেচার জন্য আলাদা কিসিমের চিড়িয়া থাকে। তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া ওই রকমই এক মক্কেলের হয়ে কাজটা করেছে।"

"কে সে?"

"পরে জেনো। যাই হোক, আবার তারকুণ্ডে-ভাটিয়ায় ফিরি। মেঘের আড়ালের মেঘনাদটির হাতে চুরির জিনিস তুলে দিতে হবে বলেই কুলু ভ্যালিতে থেকে যেতে হয়েছে জোড়া বজ্জাতকে। কিন্তু কোথায় তারা থাকতে পারে? কুলুতে যাওয়ার ঝকমারি আছে। যে-কোনও মুহূর্তে বৈজনাথের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা। তা ছাড়া কুলুতে এখন যা ভিড়, হোটেল পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।"

"আশ্চর্য, বিভব শর্মার কটেজেই তো উঠতে পারে!"

"দু'টো অসুবিধে। এক, যদি ছবি বদল ধরা পড়ে যায়, তা হলে তো পেনড্রাইভটি দেখে বিভব শর্মাই ওদের পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। দ্বিতীয় ঝামেলা, স্বয়ং বৈজনাথ। যিনি ছবির কপি করেছেন, কিন্তু পুরো টাকা পাননি।"

"তা বটে। ছ্যাঁচড়া অপরাধীদের এটাই হচ্ছে মুশকিল, এমন কিছু-কিছু গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলে!"

অবনী অনেকক্ষণ বই মুড়ে রেখেছেন। মন দিয়ে শুনছিলেন আলোচনা। খানিকটা অধৈর্য ভাবে বলে উঠলেন, "বুঝেছি-বুঝেছি। তারা কুলুতেও যাবে না, নগ্গরেও থাকবে না। তা হলে যাবে কোথায়?"

"এটাই মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন," মিতিন গালে আঙুলের টোকা দিল, "আমার মন বলছিল, কুলু, নগ্গর, মানালি, কোথাও না গিয়ে চতুর্থ একটা জায়গা বেছে নেবে। যেখানে রাত্তিরেই বা কাকভোরে তাদের পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব। কোনও যানবাহন ছাড়াই।"

"কোথায় সেটা?"

"কাছাকাছির মধ্যে কাতরেইন আছে। যেখানে হোটেল-টোটেল পাওয়া যায়। ব্যস, মনে হওয়া মাত্র চলে গেলাম কাতরেইন।"

"সে তো সাত-আট কিলোমিটার দূর! গেলে কীভাবে? তুমি তো গাড়িও নাওনি? পায়ে হেঁটে?"

"পাহাড়ি রাস্তায় অতটা হাঁটা কি সহজ কথা! একটা অটো ধরে নিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, কাতরাইনে হোটেল খুব বেশি নেই। যেতে-যেতে ভাবছিলাম, ওরা যদি হেঁটে কাতরেইন গিয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই শর্টকাট রুটটা ধরেছে। কিন্তু তার জন্য তো পাথর বেয়ে-বেয়ে বিপাশা পেরোতে হয়। আমি বিপাশার নিয়ারেস্ট হোটেলটাতেই প্রথমে খোঁজ নিলাম। এবং কী কপাল, লেগেও গেল।"

"মানে? ওখানে পেলে লোক দু'টোকে?"

"উঁহু। পাখি উড়ে গিয়েছে। শুধু জানা গেল, দুই সর্দারজি ট্রেকার ভোর চারটেয় এসেছিল হোটেলটায়। তারা নাকি কুলু ভ্যালিতে হিচ-হাইকিং করে বেড়াচ্ছে। হেঁটে-হেঁটেই নাকি তারা হিমালয়ের এই অঞ্চলটা চষে ফেলবে।"

"কী গুলবাজ রে বাবা!" সহেলি আর নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে পারলেন না, চোখ বড়-বড় করে বললেন, "জিভে মিথ্যে কথার খই ফোটে!"

"চোর-ডাকাতরা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তো আর থাকত না রে দিদি। আমাকেও বসে-বসে আঙুল চুষতে হত।"

টুপুর অধীর হয়ে বলল, "আহা, আসল খবরটা শোনাও না। ওরা কখন কাতরেইন ছেড়েছে? সকালেই?"

"তা হলে কি আগাম টাকা দিয়ে হোটেলে উঠত? আর পাঁচটা হিচ-হাইকারের মতো পথের ধারেই বসে থাকত দু'জনে," মিতিন কেটে-কেটে বলল, "তারা হোটেল থেকে ভেগেছে বিকেল সাড়ে তিনটেয়।"

পার্থ বলল, "অর্থাৎ টিভিতে ঘোষণা শুরু হওয়ার পর?"

"ইয়েস স্যার। টিভি দেখে ওরা নিশ্চয়ই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল এবং বোধ হয় তাদের নাটের গুরুর সঙ্গে যোগাযোগও করে এবং তার নির্দেশ অনুসারেই তড়িঘড়ি ওই পলায়ন," মিতিন গাল ছড়িয়ে হাসল,

"শুনে খুশি হবে, ওরা কোথায় যাচ্ছে তাও বলে গিয়েছে হোটেল-মালিককে।"

পার্থ, টুপুরের গলা কোরাসে বেজে উঠল, "কোথায়?"

"মানালি। যাওয়ার আগে নাকি একটা হোটেলের নাম-ধামও বলেছে। সস্তার জায়গা। শিবালিক লজ।"

"এ তো দারুণ খবর রে!" সহেলির হাসি আর ধরে না, "চল, আমরাও তা হলে কাল সকালে মানালি রওনা দিই।"

অবনী বললেন, "না। আগে পুলিশকে জানাও। পুলিশ ক্যাঁক করে ধরুক, তারপর নয় তুমি সিনে হাজির হও।"

"আমি একটা অন্য প্রস্তাব দেব, অবনীদা?" মিতিনের হাসি চওড়া হল, "শুনলেই অবশ্য দিদি ফায়ার হয়ে যাবে।"

"কী?"

"আমরা বরং কাল আবার কুলুতেই যাই।"

সহেলি চেঁচিয়ে বললেন, "কেন?"

"কারণ, ওরা মানালি যায়নি। পুলিশকে মিসলিড করার জন্য মানালির কথা বলেছে," মিতিনের স্বর দৃঢ় হল, "ওরা কুলুর আশপাশে থাকবে। থাকতেই হবে। অন্তত কালকের দিনটা।"

॥ ৯ ॥

আজ আর দেরি করতে দেয়নি মিতিন। ঝটপট লটবহর গাড়িতে তুলে সকাল দশটার মধ্যে সোজা কুলু। প্রথমে জেলাপুলিশের সদর দপ্তর। সেখানে তখনও আসেননি আশুতোষ। অগত্যা যেতে হল তাঁর বাংলোয়।

কাছেই পাঁচিলঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যিখানে এস পি সাহেবের বাসস্থান। তেমন একটা দেখনবাহার নয়, তবে আয়তনে বেশ বড়সড়। বাড়ি ঘিরে সবুজ ভেলভেটের মতো ঘাসের লন। গেটে প্রহরী দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে মিতিন বলল, "অবনীদা, একটু ওয়েট করতে হবে কিন্তু।"

অবনী খুশি মনে বললেন, "আমার কোনও অসুবিধে নেই। বরং তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস করো। তিনি অল্পেই অধৈর্য হয়ে পড়েন কিনা।"

অমনি সহেলির প্রশ্ন, "তোদের কতক্ষণ লাগবে?"

"আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা।"

"অত?"

"এক কাজ করুন না," পার্থ বলল, "আপনি, অবনীদা আর বুমবুম ততক্ষণ রাজবাড়িটা দেখে আসুন। তিনশো বছরের পুরনো প্রাসাদ।"

"চড়াই ভাঙতে হবে না তো?"

"না-না। গেট পর্যন্ত গাড়ি চলে যাবে।"

বুমবুম গোঁজ মুখে বলল, "তার আগে আমার চিপ্‌স চাই।"

"পাবে-পাবে।"

অবনীদের নিয়ে টিঙ্কু রওনা দেওয়ার পর রাইফেলধারী মারফত খবর পাঠাল মিতিন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকেছেন আশুতোষ। নিজস্ব অফিসঘরটিতে বসালেন মিতিন-পার্থ-টুপুরকে। মুচকি হেসে বললেন, "আপনারা তা হলে মানালিভ্রমণ ক্যানসেলই করলেন?"

"না তো। তবে আজ বোধ হয় যাচ্ছি না," মিতিন স্মিত মুখে বলল, "আসলে চুরিটা আমায় এমন হন্ট করছে। যে সে জিনিস তো নয়, ওই সব ছবি আমাদের জাতীয় সম্পদ।"

"বুঝেছি। কেসটা আপনাকে গেঁথে ফেলেছে।"

"প্রায়। শেষ না দেখে নড়তে মন চাইছে না।"

"তা হলে তো আপনাকে আরও দু'-চারটে সমাচার দিতেই হয়। তার আগে বলুন চা না কফি?"

"ঠান্ডাটা আজ বেড়েছে। কফিই ভাল।"

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন আশুতোষ। গদি আঁটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "একটা-একটা করে শোনাই? প্রথমত, আপনার অনুমান সঠিক। প্রসাদ লোকটি মোটেই নির্দোষ নয়। চোর দু'টো ওকে সত্যিই হাত করেছিল। অ্যাকর্ডিং টু প্রসাদ, ওরা নাকি রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আচমকা এসে ওকে রিভলভার দেখায়। ওর রাইফেলও নাকি কেড়ে নিয়েছিল। উপায়ান্তর না দেখে লোক দু'টোর প্রস্তাবে প্রসাদ রাজি হয়ে যায়। কোথায় বেঁধে ফেলে রাখলে সহজে কারও চোখে পড়বে না, তা নাকি প্রসাদই দেখিয়ে দিয়েছিল তখন। তবে পেয়েছে নাকি মোটে পাঁচশো টাকা।"

"ওরা যে ছবি চুরি করতে এসেছে, প্রসাদ কি জানতেন?"

"সেটা এখনও স্বীকার করছে না। বলছে, যা কিছু ঘটেছে, সবই নাকি তার অজ্ঞাতসারে। তাকে ঝোপে রেখে আসার পরে। তখন নাকি এতই ঘাবড়ে ছিল, কোনও কথা জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি!"

"প্রসাদকে ছেড়ে দিয়েছেন?"

"প্রশ্নই আসে না। আজ ওকে কোর্টে তোলা হবে। আরও সাত দিন পুলিশ কাস্টডি চাইছি।"

"হুম। আর আপনার দ্বিতীয় সংবাদ?"

"চোর দু'টো বৈজনাথ সম্পর্কে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়ে তাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে এসেছিল।"

"জানি তো। ওরা ইন্টারনেটে বৈজনাথজির নাম-ঠিকানা পেয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, বিভব শর্মার কটেজে ওঠার আগেই নাকি ওরা বৈজনাথজির সঙ্গে যোগাযোগ করে।"

"এক সেকেন্ড," আশুতোষের ভুরুতে পলকা ভাঁজ, "আপনাকে এ কথা কে বলল?"

"বৈজনাথজি স্বয়ং। মেলায় যখন দেখা হয়েছিল।"

"রং। ওরা কটেজে ওঠার পর বৈজনাথের কাছে যায়।"

"তাই কি?"

"ইয়েস। ভাড়া নেওয়া মারুতিভ্যানটির ড্রাইভার খুব জোরের সঙ্গে কথাটা জানিয়েছে।"

"বৈজনাথজি তা হলে মিথ্যে বললেন?" টুপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ইস, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।"

"হয়তো বৈজনাথকে চোর দু'টো ওরকমই বলেছিল। মানে ওই সব ইন্টারনেটের গল্প।"

কফি এসে গিয়েছে। সঙ্গে বড় প্লেটে কাজু। হাতের ইশারায় মিতিনদের নিতে বলে একটা কাপ টানলেন আশুতোষ। ছোট চুমুক দিয়ে বললেন, "আরও একটা খবর। বিভব শর্মার কটেজে ওদের আগাম বুকিং ছিল। টানা বারো দিনের। অর্থাৎ চুরির দিনটাও আগেই ফিক্স করা ছিল।"

টুপুর চমকিত। মিতিনের অবশ্য কোনও হেলদোল নেই। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "পেমেন্টটাও নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স করা ছিল?"

"হ্যাঁ। রুম-রেন্টটা। ক্রেডিট কার্ডে। ভায়া ইন্টারনেট।"

"ক্রেডিট কার্ডের নম্বরটা নিয়েছেন?"

"স্লিপ আছে বিভব শর্মার কাছে। রেখে দিতে বলেছি," আশুতোষ গলা ঝাড়লেন, "বিভব শর্মার বদ মতলব থাকলেও তো ওই নম্বর লুকোতে পারবে না। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সব বলে দেবে।"

"ঠিক। একদম ঠিক," মিতিনের ঠোঁটে হাসি, "আপনি তো খুব ভাল এগোচ্ছেন।"

"কিন্তু আসল কাজটাই তো বাকি। এত রাস্তা আটকালাম, গাড়িঘোড়া সার্চ করলাম, টিভিতে নিউজ হল, পাজি দু'টোর এখনও নো ট্রেস। এই মেলার ভিড়ে গলে বেরিয়ে গেল কিনা সেটাই এখন আমার দুশ্চিন্তা।"

"টেনশন করবেন না মিস্টার শাহ। তারা এখনও কুলু ডিস্ট্রিক্ট ছাড়েনি।"

"কী করে বলছেন?"

"নিজের গোয়েন্দাবুদ্ধি দিয়ে," মিতিন নড়ে বসল, "বাই দা বাই, বৈজনাথজির স্কেচ দু'খানা একটু দেখতে পারি?"

"অবশ্যই। আজই তো ফোটোকপি করে গোটা ভ্যালিতে ছড়িয়ে দেব। সমস্ত প্রমিনেন্ট প্লেসে টাঙানো থাকবে। বাসস্ট্যান্ড, এয়ারপোর্ট, সর্বত্র।"

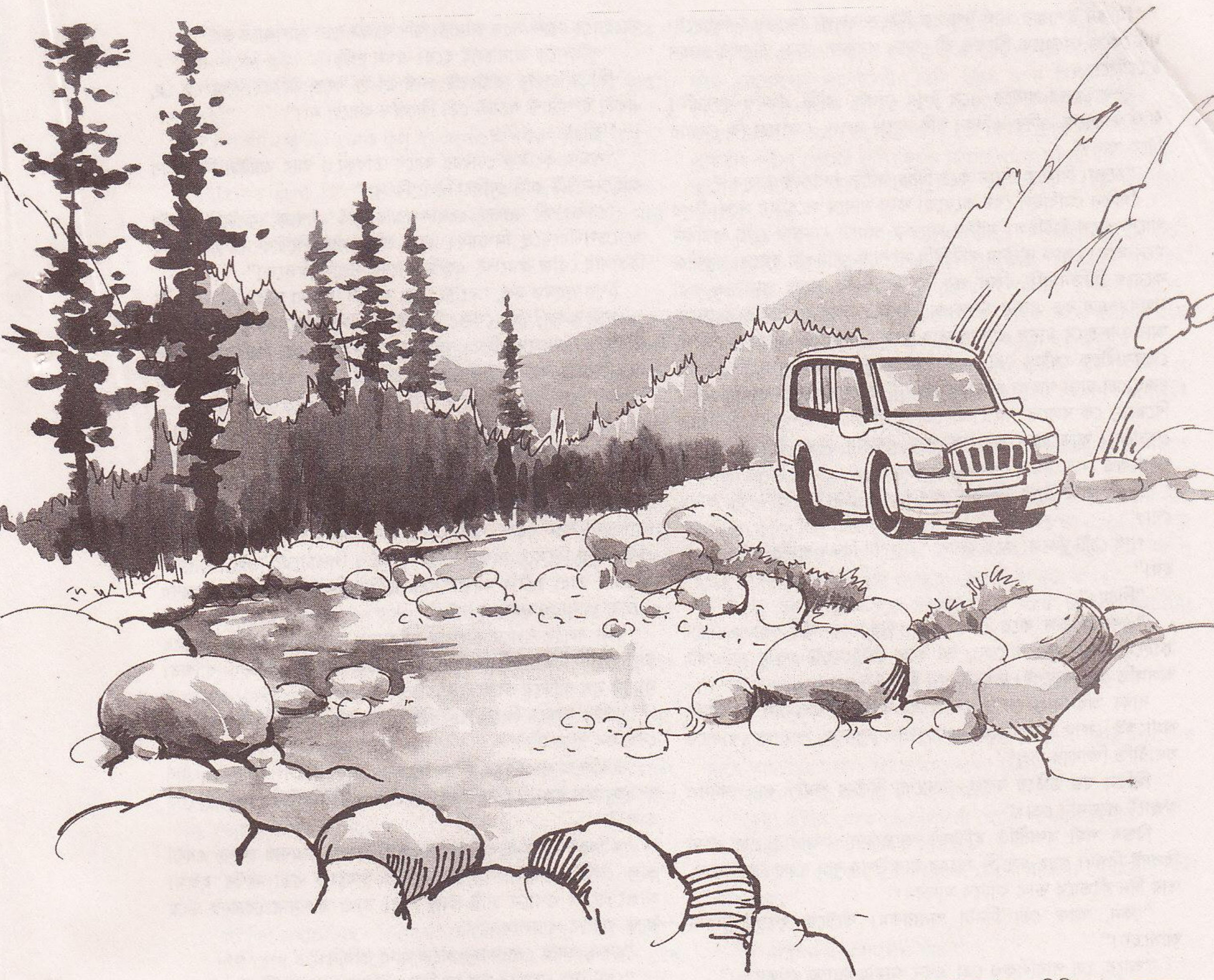

বলতে-বলতে ড্রয়ার থেকে একটা বড় খাম বের করেছেন আশুতোষ। মুখটা খুলতেই দু'খানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে দুই মূর্তির অবয়ব। স্কেচপেনসিলে আঁকা। মিতিন মন দিয়ে নিরীক্ষণ করছিল ছবি দু'টো। ঝুঁকে পড়ে পার্থ আর টুপুরও। ছবি অনুযায়ী নবীন ডিগডিগে রোগা। চৌকো মুখ, চোখ খুদে-খুদে, নাকের নীচে সরু গোঁফ। আর সুখদেব গোলগাল, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, দাড়ি-গোঁফ কামানো। কারও চেহারায় তেমন বিশেষত্ব নেই, যা দিয়ে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

আশুতোষ যেন হাল্‌কা শ্লেষের সুরে বললেন, "মুখস্থ করে নিচ্ছেন নাকি? যাতে পথেঘাটে দেখলেই চিনতে পারেন?"

"এই ছবি দেখে তা সম্ভব নয়," মিতিন দু' দিকে মাথা নাড়ল, "দু' জনের মুখেই অনেক গোঁফ-দাড়ি লাগাতে হবে। সঙ্গে মাথায় পাগড়ি।"

"কেন?"

"কারণ, ওরা সর্দারজির ছদ্মবেশে আছে যে।"

একটুক্ষণ বুঝি বাক্যস্ফূর্তি হল না আশুতোষের। তারপর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বললেন, "আ-আ-আপনি জানলেন কী করে?"

সংক্ষেপে নগ্গর আর কাতরেইনে সংগৃহীত প্রতিটি তথ্যই আশুতোষকে বলল মিতিন। লোক দু'টো যে মানালি যাবে বলেছে, সেটাও জানাতে ভুলল না এবং ওই কারণেই যে মিতিন ফের কুলুতে ফিরেছে, তাও শুনিয়ে রাখল।

আশুতোষ মুগ্ধ স্বরে বললেন, "আপনি তো ডেঞ্জারাস মহিলা! একাই পুলিশের কাজ করে দিচ্ছেন?"

"না-না, তাই কি পারি?" মিতিন যেন বিনয়ের অবতার, "আমি শুধু সাধ্যমতো আপনাদের সাহায্য করতে চাই।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। আমি এক্ষুনি চতুর্দিক চষে ফেলছি। প্রতিটি সর্দারজিকে..."

"ভুলেও ও কাজটি করবেন না মিস্টার শাহ। তাতে হিতে বিপরীত হবে। কালপ্রিটরা আরও সতর্ক হয়ে যাবে," মিতিন ঠান্ডা স্বরে বলল, "যদি আমার পরামর্শ নেন, টেলিভিশনের ঘোষণাও বন্ধ করে দিন। পারলে খবর চাউর করুন, সম্ভাব্য দুই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এদিকে তলে-তলে অনুসন্ধান চালিয়ে যান।"

"আইডিয়াটা মন্দ নয়। অপরাধীরা নিশ্চিন্ত বোধ করলে তাদের ধরতে সুবিধে হয়।"

"এখন তা হলে আসি?"

"কুলুতে থাকছেন তো? নাকি চলে যাচ্ছেন?"

"দেখি!"

মিতিন ইশারায় পার্থ-টুপুরকে উঠতে বলল। নিজেও দাঁড়িয়েছে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও কী ভেবে থমকাল যেন। তারপর হনহন হাঁটা দিয়েছে।

কম্পাউন্ডের বাইরে এসে টুপুর দেখল, গাড়ি এখনও ফেরেনি। পার্থ তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ঘড়ি দেখে বলল, "আমরা কি মেলার দিকে যাব?"

"চলো। দিদিকে ফোন করে দিচ্ছি, গাড়ি ওখানেই আসুক।"

মিতিন মোবাইল বের করেছে। কথা সারছে সহেলির সঙ্গে। টুপুর পাশে-পাশে হাঁটছিল। মাসির কাজের ধারাটা বোঝার চেষ্টা করছিল মনে-মনে। লোক দু'টোর গতিবিধি সম্পর্কে খানিকটা হয়তো আন্দাজ করেছে মিতিনমাসি, কিন্তু শুধু তা দিয়েই কি ওদের পাকড়াও করা সম্ভব? এত বড় একটা উপত্যকা, এখন মেলার সময় বাইরে থেকে আরও কত যে মানুষ এসেছে তার হিসেব নেই। তার মধ্যে থেকে দুই ভেকধারীকে খোঁজা তো খড়ের গাদায় ছুঁচের সন্ধান করার চেয়েও দুরূহ। তা ছাড়া পাহাড়-পর্বতের কোন ফাঁকফোকর দিয়ে তারা পিঠটান দিয়েছে, কে বলতে পারে! এ তো বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া করে বেড়ানো! আড়চোখে পার্থমেসোকে একবার দেখল টুপুর। মেসোর কপালেও যেন চিন্তার রেখা।

নিচু গলায় টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ও মেসো, তুমি কী ভাবছ গো?"

পার্থ ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, "একবার বিভব শর্মার কাছে গেলে হয়।"

"গিয়ে?"

"একবার ক্রস করে দেখা যেত। ভদ্রলোক যদি কোনও ভাবে ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তা হলে স্টেটমেন্টে একটা না-একটা অসঙ্গতি ধরা পড়বেই। তখনই চাপ দিয়ে..."

বাক্য অর্ধসমাপ্ত থেকে গেল। কী কাণ্ড, মিতিনমাসি যে বিভব শর্মাকেই ফোন লাগিয়েছে! এবং পার্থ-টুপুরকে সংলাপ শোনাতে যথারীতি স্পিকার চালু!

মিতিন স্বর উঠিয়ে বলল, "হ্যালো মিস্টার শর্মা? আর কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়েননি তো?"

বিভব শর্মা যথারীতি হাউমাউ জুড়েছেন, "আমার তো এখন বিপদই বিপদ। স্বয়ং এস পি সাহেব যার উপর বুরা নজর ফেলেছেন, তার দিন কীভাবে ভাল কাটবে ম্যাডাম?"

"কেন, আজ তো দিনটা অন্যরকম। কটেজে ফরেন টুরিস্ট আসছেন।"

"আরে, সে পাবলিকও তো এখন আমায় ল্যাজে খেলাচ্ছে।"

"সে কী? আজও আসছেন না বুঝি?"

"না, আসবে। তবে এবেলা নয়, রাত্তিরে।"

"স্ট্রেঞ্জ! এতক্ষণ কী করবেন সাহেব? ভুন্টারে প্লেন সব ল্যান্ড করে তো সকালবেলায়।"

"জানি তো। ভোরে আজ রবার্তো সাহেবকে রিংও করেছিলাম, দেখি লাইন বন্ধ। তারপর তো সাহেবেরই ফোন এল। খানিক আগে। কুলুতে ঢুকতে নাকি সাহেবের রাত ন'টা-দশটা বাজবে, আমি যেন কামরা রেডি রাখি।"

"তা হলে বোধ হয় বাই রোড আসছেন।"

"হতে পারে। সাহেবের খেয়াল। যাক গে, আমিও স্থির করেছি, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। দু' দিনের ঘরভাড়া তো নেওয়াই আছে, নয় আজ আর কাল একখানা রুম ফাঁকা রাখব।"

"সাহেব বুঝি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?"

"ক্রেডিট কার্ডে। থ্রু ইন্টারনেট।"

"হুম। আর কী খবর? বৈজনাথজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল!"

"খেপেছেন? আর ওর সংস্রবে থাকি? পুলিশের কোন চক্করে ফেঁসে যাব, ঠিক আছে?"

"সেই তারকুণ্ডেরাও আর নিশ্চয়ই ফোন-টোন করেনি?"

"না ম্যাডাম। যদি ভুল করেও যোগাযোগ করে, আমি এস পি সাহেবকে সঙ্গে-সঙ্গে জানাব। যদি বলেন তো আপনাকেও।"

"পুলিশকে জানালেই হবে। এখন ছাড়ি।"

মিতিন লাইন কাটতেই পার্থ হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, "এ হে হে, একটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট তো জিজ্ঞেস করলে না!"

"কী?"

"শর্মার কটেজে ঢোকার আগে তারকুণ্ডে আর ভাটিয়া নিজেদের আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়েছিল, কি না।"

"জেনে কী লাভ? দেখাক আর নাই দেখাক, কটেজে একটা অ্যাড্রেস দিয়েছে নিশ্চয়ই! এবং তারা এত নির্বোধ নয় যে, সেই ঠিকানায় খোঁজ করলেই এক্ষুনি তাদের সন্ধান মিলবে!"

টুপুর সহমত হল, "বটেই তো। আসল ঠিকানা তারা দেয় নাকি?"

পার্থ বলল, "তা কেন? দিতেই বা অসুবিধে কোথায়? তারা তো জানত না প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় বলে এক ডিটেকটিভ ঠিক পরে-পরেই কটেজে উপস্থিত হবে! প্লাস, পেনড্রাইভটাও তারা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে ফেলে যায়নি!"

"ঠিকই বলছ," মিতিন ঘাড় নাড়ল, "তাদের আসল নাম-ঠিকানা দিতেও কোনও সমস্যা ছিল না, নকল দিতেও নয়। তারা তো স্ট্রেট নগ্গর যেত, গ্যালারির ছবি পালটে মানে-মানে কেটে পড়ত। আমরা না জানালে চুরিটাই হয়তো আবিষ্কার হত না সঙ্গে-সঙ্গে। পরে যখন ব্যাপারটা ধরা পড়ত, তখন তো আর তাদের টিকি ছোঁয়ার উপায় নেই। সেই হিসেবে বিভব শর্মার কটেজও পিকচারের বাইরে থাকত। অতএব তারা সঠিক আত্মপরিচয় দেখিয়েছিল কিনা, তা আমাদের ধর্তব্যে আনারও দরকার নেই।"

কথা বলতে-বলতে ঢালপুর ময়দানের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে টুপুররা। মিনিট দু'-তিনেকের মধ্যে টিঙ্কু সিংহের গাড়িও হাজির। বুমবুম মুখ বাড়িয়ে ডাকছে টুপুরদের।

গাড়ির সামনে গিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী অবনীদা, কেমন দেখলেন রাজবাড়ি?"

সহেলি আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন, "খুব খারাপ। অমন জরাজীর্ণ দশা জানলে কখনও যেতাম না। তার চেয়ে রঘুনাথজির টেম্পলটা ঢের ভাল।"

"মন্দিরও ঘুরে এলেন বুঝি?" পার্থ হাসল, "এবার চলুন, একটা ভাল রেস্তরাঁ দেখি। সকালের টোস্ট-অমলেট তো কখন হজম। আশুতোষের ওখানে চাট্টি কাজু দিল। তাও আপনার বোনের ভয়ে দাঁতে কাটতে পারলাম না।"

"কেন, আমি তো কাজু খেতে মানা করিনি!"

"প্লেট তো তোমার সামনে ছিল। এগিয়ে তো দাওনি!"

পার্থর বলার ভঙ্গিতে সবাই হাসছে। বুমবুমও। হাসতে-হাসতে গাড়িতে উঠল টুপুররা। টিঙ্কুকে বলতেই সে গাড়ি নিয়ে সোজা কুলুর আখারা বাজারে। একটা সাজানো-গোছানো বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি-চিকেনের অর্ডার দেওয়া হল। সঙ্গে স্থানীয় নদীর ট্রাউট মাছের ফ্রাই। পাশেই দু'খানা টেবিল জড়ো করে আহার সারছে জনা দশেক সর্দারজি। মেনু রুটি-মাংস।

তেরচা চোখে তাদের দেখে নিয়ে পার্থ বলল, "কে জানে এদের মধ্যেই তারকুণ্ডেরা আছে কিনা!"

টুপুর বলল, "যাঃ, এই দঙ্গলে তারা ঢুকবে কী করে?"

মিতিন যেন আনমনা ছিল। পার্থ-টুপুরের কথায় চমকে তাকিয়েছে। টিঙ্কু একই সঙ্গে খেতে বসেছে, ফস করে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে অনেক সর্দারজিও আসেন নাকি?"

"কুলু টাউনে খুব একটা নয়। ওঁরা বোধ হয় মণিকরণ যাচ্ছেন।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "মণিকরণে কি আপনাদের কোনও তীর্থস্থান আছে?"

"হাঁ বহিন। গুরুনানকজি মণিকরণে ছিলেন কিছুদিন। ওখানে বড় গুরদোয়ারা আছে। তিন-চার হাজার আদমি এক সাথ থাকতে পারে।"

অবনী বললেন, "মণিকরণ হিন্দুদেরও তীর্থস্থান। একটা উষ্ণ কুণ্ডও আছে।"

"এক সেকেন্ড অবনীদা," মিতিন ফের ফিরেছে টিঙ্কুতে, "মণিকরণের রুটটা কী ভাই?"

"ভুন্টার আর কুলুর মাঝামাঝি মেন রোড থেকে একটা রাস্তা ঘুরেছে।"

"তার মানে ভুন্টার থেকে কুলু না এসেও মণিকরণ যাওয়া যায়?"

"হাঁ জি।"

মিতিনের চোখ যেন জ্বলে উঠল। পলকেই অবশ্য স্বাভাবিক। বিড়বিড় করে বলল, "কুলুতে আর সময় নষ্ট নয়। সকলে খেয়ে নাও চটপট। এবার মণিকরণ।"

॥ ১০ ॥

পার্বতী নদী চলেছে পাশে-পাশে। প্রায় গোটা পথ ধরে। নাচতে-নাচতে। ঝমরঝমর শব্দ বাজিয়ে। রাস্তার অন্য ধারে পাহাড়ি জঙ্গল। রীতিমতো ঘন। অরণ্যের ছায়ায় চড়াই উতরাই, সবই কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। যেন রহস্যমাখা।

টুপুর বিভোর হয়ে নিসর্গ দেখছিল। তারা যে চোর ধরতে চলেছে, তা বুঝি এখন স্মরণেই নেই। বাঁয়ে, খরস্রোতা নদীর ওপারে, কী মনোরম উপত্যকা! মাঝে-মাঝেই ঘন সবুজ চারণভূমি। চরছে ভেড়া-ছাগলের পাল। আরও খানিক দূরে খাড়া-খাড়া পাহাড়। পাইন-চির-দেবদারুতে ছাওয়া। চোখে পড়ে আপেল বাগান, শস্যশ্যামল মাঠ। হঠাৎ-হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে ধবধবে সাদা পাহাড়চূড়া, আবার হারিয়েও যাচ্ছে পরমুহূর্তে। আহা রে, এই তো স্বর্গ!

আপন মনে টুপুর বলে উঠল, "আমাদের টুর প্রোগ্রামে মণিকরণ ছিল না কেন?"

পার্থ বলল, "সত্যি, না এলে খুব লস হত কিন্তু। দিব্যি একটা জঙ্গলও দেখা হয়ে গেল।"

সহেলি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত স্বরে টিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ গো, এই পাহাড়ে কি জন্তুজানোয়ার আছে?"

"হাঁ জি," টিঙ্কু ঘাড় নাড়ল। পাহাড়ের একটা বাঁকে স্টিয়ারিং ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, "চিতা, ভল্লুক, হরিণ। তবে রাস্তায় নামে না, থোড়া দূর-দূর থাকে।"

অবনী বললেন, "শুনেছি এখানে নাকি কস্তুরীমৃগ দেখা যায়?"

"হাঁ জি। এক টাইপের বিল্লি ভি আছে। গায়ে মিঠা-মিঠা স্মেল।"

"সিভেট? সে তো খুব বিরল প্রাণী!"

"হাঁ জি। এখানে বহুত কিসিমের জানোয়ার আছে, পাখি আছে।"

পার্থ চোখ বড়-বড় করে বলল, "গুরু নানক এই সব জঙ্গল ভেদ করে এসেছিলেন?"

"একা নন, সঙ্গে আরও লোক ছিলেন। মণিকরণে পৌঁছে তাঁদের খুব খিদে পায়। কাছে চাল-আটা থাকা সত্ত্বেও উনুনের অভাবে রান্না করতে পারছিলেন না। তখন গুরু নানক একটা প্রকাণ্ড পাথর সরিয়ে গরম জলের ধারাটা বার করে দেন। জলের তাপ এত বেশি, চাল-ডাল সুন্দর সেদ্ধ হয়ে যায়। এখনও তো গুরদোয়ারার খাবার-দাবার ওই গরম জলে রান্না হয়।"

সহেলি বললেন, "ভারী মজার ব্যাপার তো! আমরাও মণিকরণের জলে চাল ফুটিয়ে দেখতে পারি।"

"অসুবিধে নেই। তবে একটু সালফারের গন্ধ পেতে পার," অবনী মতামত জানালেন, "হট স্প্রিংয়ে প্রচুর গন্ধক থাকে তো।"

"আহা, ওই জলে রান্না তা হলে লোকে খায় কী করে?"

টিঙ্কু বলল, "সহি বাত। রোজ কত আদমি গুরদোয়ারাতে খাচ্ছে, রামমন্দির ধরমশালাতেও খেতে যাচ্ছে।"

"রাম কোত্থেকে এলেন?" অবনীর ভুরুতে বিস্ময়, "মণিকরণে তো শিবের থাকার কথা।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"কারণ, এটা শিবের এলাকা। মণিকরণ নামটা কী করে হয়েছে শুনবি? শিব আর পার্বতী একদিন এখানে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পার্বতীর কান থেকে মণিকুণ্ডল খসে পড়ে। শেষনাগ নামের এক সাপ সেই মণিকুণ্ডলটি নিয়ে পাতালে ঘাপটি মারে। শিব তো রেগে কাঁই, অমনি বসে গেলেন কঠোর তপস্যায়। ধ্যানের দাপটে তাঁর তৃতীয় নয়ন ফুঁড়ে বেরোলেন নয়নাদেবী। তিনি গিয়ে হানা দিলেন পাতালে। শেষনাগ তো বেজায় ঘাবড়ে গেল, একগাদা মণি উপহার দিয়ে তুষ্ট করতে চাইল শিবকে। তা মহাদেবের তো লোভ-টোভ নেই, তিনি শুধু পার্বতীর গয়না পেয়েই খুশি। বাকি মণিগুলোকে পাথর বানিয়ে গরম জলের ধারাটিকে ঢেকে দিলেন শিব। ওই মণির সূত্রেই জায়গাটা হল।"

"বেড়ে গল্প তো!" পার্থ হেসে ফেলল, "কেসটা কেমন যেন মিতিনদেবীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না? রোয়েরিখ সাহেবের গ্যালারি থেকে রত্ন হাপিশ করে এক জোড়া শেষনাগ চম্পট দিয়েছে, আশুতোষ শাহ বসেছেন কঠোর তপস্যায়, তাঁরই তেজে বলীয়ান হয়ে থার্ড আইয়ের মিতিন ওরফে নয়নাদেবী চলেছেন রত্ন উদ্ধারে!"

অবনী হো হো হেসে উঠলেন, "এখন প্রশ্ন হল, এই শেষনাগরা কি আদৌ ঘাবড়েছে? আশুতোষের চরণে গিয়ে কি সমর্পণ করবে ছবি তিনখানা?"

"সে গুড়ে বালি। মিতিনদেবীকে ভেল্কি দেখাতেই হবে। নইলে শেষনাগদের কবজায় আনা মুশকিল।"

যাকে নিয়ে এত মশকরা, সেই মিতিনের উদাসী চোখ জানলার বাইরে। কানে কিছু ঢুকছে কিনা বোঝা দায়। হঠাৎই কী ভেবে যেন দৃষ্টি ঘোরাল। দূরমনস্ক স্বরে টিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই, বলো তো, মণিকরণ থেকে আর কোথায়-কোথায় যাওয়া যায়?"

"কুলু ছাড়া মণিকরণে বাসরুট তো আর একটাই ম্যাডাম। মণিকরণ থেকে বারসোনি।"

"জায়গাটা কত দূর?"

"মণিকরণ পেরিয়ে আরও বারো-চোদ্দো কিলোমিটার।"

"কী আছে সেখানে?"

"হাইডেল প্রোজেক্ট। পার্বতীর জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। আর আছে পাহাড়ের মাথায় জমলু মহাদেবের মন্দির।"

"বারসোনিতে থাকার কী বন্দোবস্ত?"

"নেই। ওখান থেকে হেঁটে পুলগাঁ গেলে বাড়িঘর মেলে।"

"কাছাকাছি আর কোনও জায়গা?"

"মণিকরণ থেকে হেঁটে ক্ষীরগঙ্গা যেতে পারেন। যেখানে পার্বতী নদীর শুরু।"

"আর?"

"দু'-চারজন মালানাতেও যায়।"

"সেখানে কী আছে?"

"মালানা এক আজব উপত্যকা ম্যাডাম। বহুকালের পুরনো। লোকে বলে, সিকান্দার শাহের কিছু সৈন্য ওখানে রয়ে গিয়েছিল। তাদের বংশধররাই নাকি মালানার বাসিন্দা।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "সিকান্দার শাহ.....মা-মানে কি গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার?"

"হাঁ জি। মালানার মানুষ নিজেদের মতো আইনকানুন বানিয়ে নিয়েছে। কেউ ওদের বিরক্ত করে না। ওখানে নাকি রাশি-রাশি ধনরত্ন, কিন্তু কোনও চুরি-ডাকাতি নেই। পাহারারও প্রয়োজন হয় না। ওরা কথা বলে কানাশি ভাষায়। ভোট দিয়ে নিজেরাই নিজেদের নেতা নির্বাচন করে, তারা ওদের দেখভাল করে।"

"মালানায় হোটেল-টোটেল আছে?"

"না জি। ট্রেকিং পার্টি গিয়ে তাঁবুতে থাকে। বাইরের লোকদের ব্যাপারে ওরা ভীষণ কড়া। গাঁয়ের মধ্যে বাঁধানো রাস্তা ছাড়া কাউকে হাঁটতে দেবে না। ওদের কাউকে আপনি ছুঁতে পারবেন না। কোনও জিনিসে হাত লাগালে হাজার টাকা জরিমানা।"

"এমন আবার হয় নাকি?" টুপুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। জিজ্ঞাসু চোখে পার্থর দিকে তাকাল। পার্থর আগে অবনীই বললেন, "এরকম কিছু-কিছু উপজাতি কিন্তু এখনও টিকে আছে ভারতে। এই তো, লাদাখের কাছে একটা গ্রামে বাস করে আট-দশ ঘর খাঁটি আর্য

পরিবার। অসমে আছে কিছু থাইল্যান্ডের অধিবাসী। মুর্শিদাবাদ না ঢাকা কোথায় যেন কয়েকটা পর্তুগিজ পরিবারও আছে বলে শুনেছিলাম।"

মিতিন ফের কী যেন ভাবছিল। টিঙ্কুকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, ট্রেকারদের মালানা যেতে কতক্ষণ লাগে?"

"এক দিনে পৌঁছনো খুব কঠিন ম্যাডাম। অনেকটা দূর। কম করে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার। রাস্তা বলতেও তো প্রায় কিছু নেই, পাহাড় ধরে এগোতে হয়।"

"ও।"

মিতিন আবার চিন্তার সাগরে। এমন গম্ভীর করে রেখেছে মুখখানা, কথা বলতে সাহস হয় না। ট্রেকিং রুটের খবর কেন নিচ্ছিল, তা জানারও উপায় নেই। অগত্যা কী আর করা, কৌতূহল গিলে প্রকৃতির শোভা দেখছে টুপুর।

খানিকক্ষণ পর হঠাৎ টিঙ্কুর গলা, "একটা সওয়াল করতে পারি ম্যাডামজি?"

মিতিনের বদলে পার্থর প্রশ্ন, "কী?"

"আমি জানি, কাল নগ্গরে তসবির চুরি হয়েছে। তখন থেকেই দেখছি, ম্যাডামজির সঙ্গে পুলিশের খুব জান পহেচান। ম্যাডামজি কি এনকোয়্যারি করছেন?"

"হুম। ম্যাডাম একজন গোয়েন্দা। চোর ধরায় ওস্তাদ।"

"সচ্?" টিঙ্কুর চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল। মাথা দুলিয়ে বলল, "ওউর এক বাত। ম্যাডামজি কি কোনও সর্দারকে সন্দেহ করছেন?"

"ঠিক তা নয়। তবে যারা চুরি করেছে, তারা সর্দারজি সেজেছিল। এখনও বোধ হয় সেই বেশেই আছে।"

"মণিকরণ সাহিবে তাদের ধরবেন?"

"দেখা যাক। যদি ইতিমধ্যে না ভেগে থাকে।"

"লেকিন...ওরা তো কাসোল থেকেও পালাতে পারে।"

"কাসোল?" মিতিনের ঘাড় হঠাৎ স্প্রিংয়ের মতো ঘুরেছে, "সেটা কোথায়?"

"এই তো, সামনেই। মণিকরণের তিন-চার কিলোমিটার আগে। ওখানেই তো দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড। দিল্লি, চণ্ডীগড়, সিমলা, কোথাকার না বাস ছাড়ে। বহুত আচ্ছা সার্ভিস। রাতে স্টার্ট করে, সকালে পৌঁছে দেয়।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ জি। কাসোল ভি বড়িয়া টুরিস্ট স্পট। পার্বতী নদী, জঙ্গল, পাহাড়, সুন্দর-সুন্দর ভিউ। অনেক ফরেনার তো মণিকরণের বদলে কাসোলেই থাকে। ভাল-ভাল লজ আছে।"

উৎসাহ নিয়ে বলছে টিঙ্কু। কিন্তু মিতিনের যেন আর আগ্রহ নেই। ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করল। কী একটা নম্বর টিপতে গিয়েও থেমেছে মাঝপথে। মোবাইল ফের ব্যাগে চালান করে আপন মনে বলল, "নাঃ, মণিকরণই যাওয়া যাক।"

তা মণিকরণ পৌঁছতে আরও আধ ঘণ্টাটাক লাগল। প্রথমেই শিখদের বিশাল গুরুদ্বার। মণিকরণ সাহিব। টিঙ্কু গাড়ি থামাবে কিনা জিজ্ঞেস করল, না বলল মিতিন। আর একটু এগোতেই পার্বতী নদীর ব্রিজ, তারপর মূল জনপদ। ছোট, তবে বেশ জমজমাট শহর। প্রচুর দোকানপাট, দু' পা অন্তর মন্দির, পথের ধারে যত্রতত্র উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করছে লোকজন। হালকা একটা গন্ধও ভাসছে বাতাসে। তুবড়ি-তুবড়ি ঘ্রাণ। নিশ্চয়ই সালফারের। চতুর্দিকে পেল্লাই উঁচু-উঁচু পাহাড় যেন জেলখানার পাঁচিল হয়ে ঘিরে রেখেছে মণিকরণকে। শুধু পুব দিকেই যা একটুকু ফাঁক। সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে হিমালয়ের বরফ চুড়ো। ওই পথেই লাফাতে-লাফাতে নামছে পার্বতী। স্রোতের কী গর্জন, বাপস!

মিতিনের নির্দেশে টিঙ্কু বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে গেল গাড়ি। দরজা খুলতে-খুলতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি এখন জায়গাটা ঘুরে দেখবে?"

সহেলি বললেন, "আগে একটু জিরিয়ে নিলে হত না?"

"পাশেই তো ধরমশালা। আপাতত ঢুকে পড়ো।"

"আমরা হোটেল নেব না?"

"সে হবে'খন। এখন ফ্রেশ তো হয়ে নাও। তারপর টাউনটা দ্যাখো।"

"আর তুই?"

"পরে জয়েন করছি।"

টুপুর মাসির সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। রয়ে গেল পার্থ আর বুমবুমও। সহেলি-অবনীকে নিয়ে রামমন্দির ধরমশালায় গেল টিঙ্কু।

বুমবুম বড়-বড় চোখে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি কি এখনই চোর ধরবে?"

"আগে একটু চা তো খাই।"

মিতিন পায়ে-পায়ে বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানটায় ঢুকল। টুপুর আর বুমবুমকে চিপ্‌স কিনে দিয়ে পার্থর সঙ্গে চুমুক দিচ্ছে মশলাদার চায়ে। আয়েশ করে। সামনেই একটা বাস দাঁড়িয়ে। প্রায় ফাঁকা। একটা-একটা করে লোক উঠছে। এক অল্পবয়সি পাহাড়ি ছেলে যাত্রীদের মালপত্র তুলে দিচ্ছে ছাদে। বাসটাকে দেখতে-দেখতে মিতিন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "এটা যাচ্ছে কোথায়?"

"কুলু। আখারা বাজার।"

"ছাড়বে কখন?"

"টাইম তো সাড়ে তিনটে। তবে লাস্ট বাস তো, গাড়ি বোঝাই না হলে নড়বে না।"

"সে কী? সাড়ে তিনটের পরে আর বাস নেই?"

"একটা ছিল। তার ইঞ্জিন গড়বড় করছ। আজ যাবে না।"

"ও।"

মিতিন আবার নির্লিপ্ত মুখে চুমুক মারছে কাচের গ্লাসে। টুপুর খানিক অসহিষ্ণু স্বরে বলল, "আমরা এখানে বসে আছি কেন?"

"চান্স নিচ্ছি।"

"কিসের চান্স?"

"আলটপকা আশমান থেকে যদি কিছু খসে পড়ে!"

পার্থ গজগজ করে উঠল, "ফালতু টাইম নষ্ট করছ কিন্তু। এভাবে গা এলিয়ে দিলে কালপ্রিটদের হদিশ পাবে?"

"তা হলে কী করা উচিত শুনি?"

"গুরদোয়ারায় গিয়ে খোঁজ নাও।"

"কীভাবে?"

"এই যেমন ধরো, লোক দু'টো যদি কাতরেইন থেকে তিনটে-সাড়ে তিনটেয় রওনা দেয়, তা হলে তারা এখানে কখন পৌঁছেছে? অ্যারাউন্ড সন্ধে সাত-আটটা? আমরা যদি গুরদোয়ারায় গিয়ে চেক করি, সন্ধে সাতটার পর কারা কারা এসেছে।"

"প্রথমত, তারা অ্যালাও করবে কেন? দ্বিতীয়ত, যদি তোমার আবদার শুনে পুলকিত হয়ে নামধাম জানায়ও, দেখে কিছু বোঝা যাবে কী? নাকি তুমি জনে-জনে ডেকে দাড়ি টেনে দেখবে?"

বুমবুম হি হি হাসছে। পার্থ গুম। দু'-চার সেকেন্ড পরে ফের বলল, "তবু...ওই গুরদোয়ারাই কিন্তু লুকনোর আসলি জায়গা। ওখানে প্রচুর লোক থাকে। তা ছাড়া ভিতরে যদি না-ও যাই, সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। দু' মক্কেল যদি ভুলক্রমেও তখন গুরদোয়ারা থেকে বেরোয়..."

"অমনি তাদের চিনে ফেলবে? সকালের স্কেচ দু'টোয় মনে-মনে দাড়ি-পাগড়ি লাগিয়ে?"

"তা হলে তুমি চাইছটা কী? মণিকরণে এলে কেন?"

টুপুর বলল, "অন্তত পুলিশের কাছে চলো। তারপর তাদের নিয়ে..."

"অ্যাই, চুপচাপ বসবি? না পোষায় তো তোরা দু'জনে সোজা উষ্ণ কুণ্ডে যা। গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে থাক। চমৎকার মাসাজ হবে।"

টুপুর গোঁজ হয়ে গেল। পার্থ রেগেমেগে দোকানের বাইরে। গোমড়া মুখে আকাশ দেখছে। ঠিক তখনই ভোজবাজি!

মিতিন তড়াক লাফিয়ে উঠেছে বেঞ্চি ছেড়ে। তির বেগে ছুটছে

বাসটার দিকে। গালপাট্টাধারী এক রোগা সর্দারজি পাহাড়ি ছেলেটাকে একটা বোঁচকা দিচ্ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরেছে লোকটার হাত। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, "নবীন তারকুণ্ডে, ইয়োর টাইম ইজ ওভার।"

চমকে তাকিয়েছে লোকটা। পলকের জন্য থতমত। পরক্ষণে চোখা হিন্দিতে তেড়ে উঠল, "কে তারকুণ্ডে? আপনিই বা কে?"

"চালাকি করবেন না তারকুণ্ডে। কড়াটা আপনি অন্য হাতে পরেছেন। প্রকৃত শিখ কখনও এই ভুলটা করে না।"

লোকটা আরও চমকেছে। পরিবর্ত ক্রিয়াতেই বুঝি কড়াখানা লুকোতে চাইল। খিঁচিয়েও উঠেছে সঙ্গে-সঙ্গে, "কী আজেবাজে বকছেন?"

আর একজন স্বাস্থ্যবান সর্দারজি একটু তফাতে ছিল। তড়িঘড়ি এগিয়ে এসেছে। উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, "হচ্ছেটা কী এখানে? তীর্থস্থানে এসে আপনি আমাদের সঙ্গে অসভ্যতা করছেন?"

প্রথমজন আঙুল তুলে শাসাল, "যান-যান এখান থেকে। নইলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।"

"তড়পে লাভ নেই। গোটা বাসস্ট্যান্ড পুলিশ ঘিরে রেখেছে। মানে-মানে দু'জনে সারেন্ডার করেন তো ভাল। নইলে..."

"কী করবেন, অ্যাঁ?"

সম্ভবত রিভলভার বের করতে যাচ্ছিল তারকুণ্ডে, তবে সময় পেল না। জনা পাঁচেক সাদা পোশাকের পুলিশ ঝটিতি ঘিরে ফেলেছে দুই মূর্তিমানকে। মুহূর্তে পরিয়ে দিল হাতকড়া। টানতে-টানতে নিয়ে চলেছে থানায়।"

মিতিন পার্থকে ঠেলল, "এবার নিশ্চিন্ত মনে দাড়ি টেনে দেখতে পার।"

টুপুর হতভম্ব মুখে বলল, "তু-তু-তুমি...পুলিশকে কখন...?"

মিতিন হাত ঝাড়ছে। টুপুরের গালে আলতো টোকা দিয়ে বলল, "এখনও অনেক কিছু দেখতে পাবি রে।"

॥ ১১ ॥

একটার পর-একটা ঘটনা ঘটেই চলেছে নাটকীয় ভাবে। টুপুররা থানায় পৌঁছতে না-পৌঁছতে হঠাৎ আশুতোষ শাহের উদয়। তিনি নাকি মিতিনদের পর-পরই রওনা দিয়েছিলেন কুলু থেকে। পথে গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়ায় এইমাত্র এসে পৌঁছলেন। মিতিনমাসির সঙ্গে বাক্যালাপে বোঝা গেল, তাঁর নির্দেশেই মণিকরণের পুলিশ আজ তৎপর ছিল। কোথায় কখন কী ভাবে পুলিশকে হাজির থাকবে হবে, তাও নাকি এস পি সাহেবকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল মিতিনমাসি। কুলু ছাড়ার আগেই। শুধু কোন ফাঁকে যে মিতিনমাসি ফোনটা করেছিল, সেটা এখনও টুপুরের অজানা। ইস, কেন যে টুপুর প্রতিটি মুহূর্তে মাসিকে অনুসরণ করতে পারে না!

এখন শুরু হয়েছে আর একপ্রস্থ নাটক। রীতিমতো পিলে চমকানো। তারকুণ্ডে আর ভাটিয়ার ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলেছে পুলিশ, তল্লাশির পালাও শেষ। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মণিকরণ থানার ও সি সুদেশ বাংরু। তন্নতন্ন করে হাতড়েও তিনি তারকুণ্ডেদের কাছ থেকে ছবিগুলো বের করতে পারেননি।

আশুতোষ শাহ ধমকে উঠলেন, "চোর ধরা পড়ল, অথচ তাদের কাছে ছবি নেই, এ হতে পারে?"

"ওদের বডি পর্যন্ত সার্চ করলাম স্যার। ব্যাগ থেকে শুধু তিন বানডিল ডলার মিলেছে। মোট তিরিশ হাজার। গুনে দেখেছি।"

"এত ডলার পেল কোত্থেকে?"

"দু'টোই খুব পাজি, কিছুতেই মুখ খুলছে না।"

"সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না, আঙুল বেঁকান। রুলের গুঁতো দিন।"

"সে কী আর বলতে হবে স্যার? কিন্তু দু'জনেই যেন ঠোঁটে তালা লাগিয়েছে।"

"প্রেশার জারি রাখুন। একদম ঢিলে দেবেন না।"

"ওকে স্যার।"

সুদেশ বাংরু বেরিয়ে যেতেই আশুতোষের গলা থেকে একরাশ হতাশা ঝরে পড়ল, "যাঃ, লোক দু'টোকে ধরা কি তা হলে বৃথা গেল ম্যাডাম?"

মিতিনের কোনও হেলদোল নেই। অবিচলিত স্বরে বলল, "তা কেন মিস্টার শাহ? চুরির প্রমাণ তো মিলেছে।"

"কোথায়?"

"ডলারগুলো! ছবির বিনিময়ে ওদের যা জুটেছে।"

"অর্থাৎ ছবিগুলো পাচার করে দিয়েছে বলছেন?"

"অবশ্যই। ছবি এখন মূল অপরাধীর জিম্মায়।"

"সর্বনাশ, তাকে এবার পাব কোত্থেকে?"

"টেনশন করবেন না, সে বাছাধন এখনও পালায়নি।"

"মণিকরণেই আছে?"

"উহুঁ। কুলুতে। আপনার বাংলোর এক-দু' কিলোমিটারের মধ্যেই।"

"মানে?"

"পুরোটা জানতে হলে এক্ষুনি যে আমাদের কুলু যেতে হবে মিস্টার শাহ।"

ওসির চেয়ারে বসে ছিলেন আশুতোষ। তড়াক লাফিয়ে উঠেও কুণ্ঠিত মুখে বললেন, "কিন্তু ম্যাডাম, সন্ধে নেমেছে। অন্ধকারে এখন কুলু যাবেন? তা ছাড়া সারাদিন আপনাদের যা ধকল চলছে..."

"উপায় নেই স্যার। রাত পোহালেই পাখি উড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।"

"তাই নাকি?" আশুতোষের ভুরুতে ভাঁজ, "আপনি শিওর, ছবি পাওয়া যাবে?"

"একশো শতাংশ নিশ্চিত।"

"কুলুতে ঠিক কোথায় যাবেন বলুন তো?"

"বিভব শর্মার ডেরায়।"

শুনেই বেজায় চমকেছেন আশুতোষ। পরক্ষণে দৃষ্টিতে একটা জিঘাংসার ভাব ফুটে উঠল, "তাই বলুন। শর্মাই তা হলে কালপ্রিট! আমারও লোকটার উপর সন্দেহ ছিল।"

মিতিনের ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি। মাথা দুলিয়ে বলল, "চলুন তা হলে। আমিও আমার ব্যাটেলিয়ানকে রেডি করে ফেলি।"

থানা থেকে বেরনোর আগে উঁকি দিয়ে একবার তারকুণ্ডেদের দেখে এল টুপুর। অবিকল বৈজনাথের স্কেচের মতো না হলেও চেহারায় অনেকটাই মিল। মুন্ডু ঝুঁকিয়ে গারদে বসে আছে লোক দু'টো, সামনে সুদেশ বাংরু কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে।

বুমবুমও গিয়েছিল টুপুরের সঙ্গে। চোখ বড় করে বলল, "এরা তা হলে আসল চোর নয়?"

"উঁহু। এদের একজন বস আছে, আমরা এখন তাকে ধরতে যাব।"

"মানে কটেজের মালিকটাই?"

"হ্যাঁ রে।"

ঘাড় নেড়ে টুপুর বলল বটে, কিন্তু এখনও তার ধন্দ কাটছে না। সত্যি বলতে কী, মাসির কাজের ধারা এবার যেন কেমন-কেমন! ধরে নেওয়া যাক, বিভব শর্মার হাতে ছবি জমা দিয়ে তারকুণ্ডেরা মণিকরণে গা ঢাকা দিতে এসেছিল এবং এখান থেকেই কাসোল-টাসোল হয়ে চম্পট দিত দু'জনে। একেবারে হিমাচল প্রদেশের বাইরে। আর সেটা ঠেকাতেই বুঝি মিতিনমাসির তড়িঘড়ি মণিকরণে গমন। কিন্তু ছবিসমেত বিভব শর্মাকে মুঠোয় না পুরে আগে তারকুণ্ডে-ভাটিয়াকে তাড়া করা কেন? পাখি উড়ে যাওয়া ব্যাপারটাই বা কী? বিভব শর্মা পালাবেন নাকি? লোকটার মতলব কীভাবে আগাম অনুমান করল মিতিনমাসি? কোনও ক্লু পেয়েছে? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ভালমানুষের মুখোশ পরা বিভব শর্মাকে ছবিচুরি-চক্রের পান্ডা হিসেবে সন্দেহ করছে, এটাও মিতিনমাসি কাউকে ঘুণাক্ষরে টের পেতে দিল না? উলটে শর্মার হয়ে সাফাই গাইছিল!

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফের টিঙ্কুর রথে আরোহণ। টুপুররা ফিরছে কুলুতে। সামনে লালবাতি জ্বালিয়ে আশুতোষ শাহের জিপ। পাইলট-কারের মতো। কোজাগরী পূর্ণিমার

চাঁদও চলেছে সঙ্গে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দর্শন দেয় হঠাৎ-হঠাৎ, আবার হারিয়েও যায়। লুকোচুরি খেলছে যেন। অন্ধকারের নির্জনতায় পার্বতীর আওয়াজও বুঝি বেড়ে গিয়েছে চতুর্গুণ। যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

বাইরে কনকনে ঠান্ডা। জানলার বন্ধ কাচ বাষ্প মেখে ঝাপসা। টুপুর তবু ওই কাচেই চোখ রেখে বাইরেটা দেখছিল। বাকিরা কেউ ঢুলছে, কেউ বা নিছকই চোখ বুজে বসে। সত্যি তো, একদিনে এত ছোটাছুটি কারও পোষায়! আজই মণিকরণ ছাড়তে হবে শুনে সহেলি তো প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন, এখনও তাঁর মুখে সেই অসন্তোষের ছোঁয়া। অবনীর নিশ্চিন্ত ঢুলুনি দেখে রাগটা বুঝি আরও বেড়ে গেল। গুমগুমে গলায় বলে উঠলেন, "কুলুতে তো হোটেল মেলার চান্স নেই। সুতরাং আজ নিশ্চয়ই গাড়িতেই রাত্রিবাস?"

পার্থ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না-না, মিস্টার শাহের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন।"

"কোথায়? হাজতে?"

"যাঃ, কী যে বলেন!" পার্থ হেসে ফেলল, "আমরা উঠব সার্কিট হাউসে। ভি আই পি আস্তানায়। আরামসে ঘুমোতে পারবেন।"

"সে কপাল কী করে এসেছি! মিতিনের যদি বাই চাপে, তো রাত দু'টোয় হয়তো রওনা হতে হল কোথাও!"

"টেনশন করবেন না দিদি। মিতিনের বায়না আর শুনবই না। রাতটুকু বিশ্রাম নিয়ে কাল আমরা মানালি যাব। যাবই।"

যাকে নিয়ে সহেলির এত গজগজ, সেই মিতিন কিন্তু নিশ্চুপ। ঝড়ের আগে আকাশের মতো থমথম করছে তার মুখখানা। গাড়ি কুলুতে ঢোকার পর টানটান হয়ে বসল। বিভব শর্মার কটেজে চার চাকা থামতেই তড়াং নেমেছে। আশুতোষ শাহের সঙ্গে সোজা গেট ঠেলে অন্দরে। পিছনে দমচাপা উত্তেজনা নিয়ে টুপুর আর পার্থ।

আশুতোষকে দেখে বিভব শর্মার মুখ নিমেষে পাংশু। আমতা-আমতা করে বললেন, "স্যার, আপনি...? ম্যাডামের সঙ্গে...?"

"ভেবেছেন কী, অ্যাঁ? কুলুর মানুষ হয়ে বদমতলব আঁটছিলেন?" আশুতোষ গর্জে উঠেছেন, "বের করুন, বের করুন ছবিগুলো।"

"ছ-ছ-ছবি... কী ছবি?"

"ন্যাকা সাজবেন না। আপনি তো নাটের গুরু।"

"কী বলছেন স্যার? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"এক মিনিট। আমি বলছি," আশুতোষকে টপকে মিতিন সামনে এল। কেজো গলায় বিভব শর্মাকে বলল, "আপনার সেই ইটালিয়ান সাহেবটি এসেছেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। বিকেলেই পৌঁছে গিয়েছেন। সাড়ে চারটে নাগাদ।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"রুমে। এসেই বললেন তাঁকে যেন বিরক্ত করা না হয়। রাত দশটায় উনি নীচে নেমে ডিনার সেরে যাবেন।"

"কোন ঘরটায় আছেন উনি?"

"বাঁ দিকেরটায়। কেন ম্যাডাম?"

জবাব না দিয়ে মিতিন আশুতোষকে ডাকল, "চলুন। চটপট।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় টোকা দিল মিতিন। মিনিট দুয়েক পর পাল্লা খুলল। নীলচে চোখ, টকটকে রং, মাঝারি উচ্চতার রবার্তো জোয়ান্নি একবার মিতিনকে দেখলেন, একবার সুট-টাই পরিহিত আশুতোষকে। রুক্ষ স্বরে বললেন, "কী চাই?"

"আপনাকেই," মিতিনের সপ্রতিভ উত্তর, "ভিতরে যেতে পারি?"

"অবশ্যই না। আমি এখন ব্যস্ত আছি।"

"কিন্তু আমাদের যে ঢুকতে দিতে হবেই মিস্টার জোয়ান্নি। আপনার ঘরটা তল্লাশ করা যে খুবই জরুরি।"

"কেন?" এবার রবার্তো যেন নাড়া খেয়েছেন। চোখ সরু করে বললেন, "কে আপনারা?"

আশুতোষ শাহকে দেখিয়ে মিতিন বলল, "ইনি কুলু ডিস্ট্রিক্টের সুপারিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ। আমাদের কাছে খবর আছে, আপনি নিকোলাস রোয়েরিখের তিনখানা ছবি চুরি করিয়েছেন। এখন কি মানে-মানে ছবিগুলো ফেরত দেবেন? নাকি আমরাই খুঁজে নেব?"

রবার্তো মন দিয়ে শুনলেন কথাগুলো। তারপর হঠাৎই হা হা হেসে উঠেছেন, "কী আজগুবি অভিযোগ! আমি একজন ভারতপ্রেমী বিদেশি। ওই ধরনের নোংরা কাজ আমি কখনও করতে পারি?"

রবার্তোর বাচনভঙ্গিতে আশুতোষ বেশ হকচকিয়ে গিয়েছেন। অস্বস্তি ভরা চোখে তাকাচ্ছেন মিতিনের দিকে। যেন বলতে চাইছেন, মিতিনের কোনও ভুল হয়নি তো?

মিতিন কিন্তু অটল। ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি তা হলে রুম সার্চ করতে বাধ্য করছেন?"

"না-না, আপনারা দেখতেই পারেন। প্লিজ কাম ইনসাইড। আমার সামান্য লাগেজ তো সামনেই পড়ে। খুলে দেখে নিন।"

সত্যিই মালপত্র তেমন নেই রবার্তোর। একটা ক্যামেরার ব্যাগ আর একখানা হ্যাভারস্যাক। ঈষৎ দ্বিধা নিয়ে আশুতোষ হাত লাগালেন অনুসন্ধানে। পার্থও। ক্যামেরার ব্যাগ থেকে বেরোল ভাঁজ করা তেপায়া স্ট্যান্ডসহ একটি অতি মূল্যবান ডিজিটাল ক্যামেরা। সঙ্গে খাপে একগুচ্ছ টেলিলেন্স। হ্যাভারস্যাকে রয়েছে সাহেবের জামাকাপড়, বই আর দৈনন্দিন ব্যবহারের কিছু টুকিটাকি। আসল জিনিসগুলো না পেয়ে আশুতোষ খুলে-খুলে দেখছেন ওয়ার্ড্রোব, ড্রয়ার, ড্রেসিংটেবিল। পার্থ ছুটল বাথরুমে। সিস্টার্নের ঢাকা, গিজারের মাথা। কিছুই নিরীক্ষণ করতে ভুলল না। টুপুর উঁকি দিল নিভে থাকা ফায়ারপ্লেসের অন্দরে। খাট, বিছানা, সরিয়ে-সরিয়েও দেখলেন আশুতোষ। নাঃ, ছবিগুলো কোথাও নেই।

চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসছিলেন রবার্তো। বললেন, "এখনও কিন্তু কার্পেট তুলে দেখা হয়নি। আমি কি হেল্প করব?"

আশুতোষের মুখ লাল। হিন্দিতে চাপা গলায় মিতিনকে বললেন, "এইভাবে আমাকে বেইজ্জত করার কোনও মানে হয়?"

মিতিন রা কাড়ল না। আস্তে-আস্তে ক্যামেরাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাড় হেলিয়ে রবার্তোকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বুঝি প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার?"

"পুরোপুরি নই। তবে ফোটো তোলা আমার নেশা।"

"ও," মিতিন তেপায়া স্ট্যান্ডখানা হাতে তুলে নিল, "পাহাড়ের ফোটো তুলতেও কি আপনি স্ট্যান্ড ব্যবহার করেন?"

"কখনও-সখনও করি বইকি। সানরাইজ, সানসেটের সময়ে ওটা খুব কাজে লাগে।"

ঝপ করে একটা পায়ার তলায় হাত রাখল মিতিন। চাড় দিয়ে ঘোরাতেই খুলে গিয়েছে পায়া। ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে বের করল একখানা ছবি। রোল করে পোরা ছিল পায়াটায়।

পাকানো ছবিটা খুলতে-খুলতে মিতিন বলল, "কায়দাটা ভালই নিয়েছিলেন মিস্টার জোয়ান্নি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।"

রবার্তোর মুখ-চোখ পলকে বদলে গিয়েছে। দৃষ্টি দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে যেন। হিংস্র রাগে মিতিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, ত্বরিত পায়ে সরে গেল মিতিন। সঙ্গে-সঙ্গে আশুতোষের হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। সেফটি ক্যাচ তুলে দিয়ে বললেন, "ডোন্ট মুভ। একচুল নড়লে গুলি করতে বাধ্য হব।"

ক্যামেরা স্ট্যান্ডের বাকি দু'টো পায়া থেকে মিতিন বের করল আরও দু'খানা পেন্টিং। তার হাতে যেন এখন তিন টুকরো হিমালয়। জলরঙে আঁকা। প্রতিটি ছবির তলায় নিকোলাস রোয়েরিখের স্বাক্ষর।

মিতিন বিদ্রুপের সুরে বলল, "রাতটা আর সকাল হল না মিস্টার জোয়ান্নি। ভুন্টার থেকে কাল ভোরের ফ্লাইট আপনাকে ছাড়াই উড়বে। শুনে কষ্ট পাবেন, তিরিশ হাজার ডলার সমেত আপনার দুই এজেন্টও এখন পুলিশের হেফাজতে।"

রবার্তো জোয়ান্নি ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। তাঁর কাঁধ দু' খানা ঝুলে গিয়েছে।

॥ ১২ ॥

রোটাং পাসের পথ যথেষ্ট দুর্গম। রাস্তাটা অসম্ভব খাড়াই এবং বেশ

ভাঙাচোরা। টিঙ্কুর প্রাণপণ চেষ্টাতেও গতি বাড়ছিল না, গোঁক-গোঁক করছে গাড়ি। একটা করে বাঁক পেরোয়, চরকি খেয়ে যায় মাথা। একই সঙ্গে খুলে যায় হিমালয়ের নব-নব রূপ।

অবশেষে কাল বিকেলে মানালি পৌঁছেছে টুপুররা। উঠেছে একটি চমৎকার হোটেলে। হিড়িম্বা টেম্পলের কাছে। আবার ম্যাল, বিপাশাও দূরে নয়। ঘরের জানলা খুললেই পিছনে এক আপেল-বাগান। লাল আভা মাখা সোনালি আপেল গাছ থেকে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। তার ওপারে হিমালয়। সার-সার বরফে ঢাকা চুড়ো যেন পাহারা দিচ্ছে সুন্দরী মানালিকে। এসেই কাল রাতে টুপুররা গিয়েছিল বিপাশার পারে। সেও এক মনোহর অভিজ্ঞতা। চাঁদের কিরণে ঝিকঝিক করছে বিপাশা। যেন কুচি-কুচি হিরে ভাসছে স্রোতে। জ্যোৎস্না মেখে বরফে ঢাকা পাহাড়ও কী স্নিগ্ধ তখন!

মানালি আসার পথে টুপুরদের আর একবার যেতে হয়েছিল নগ্গর। আশুতোষ শাহ আর কিষানলাল দুগ্গারের সনির্বন্ধ অনুরোধে। এমন চর্বচোষ্য খাওয়া হল, পার্থমেসোর প্রায় হাঁসফাঁস দশা। মিতিন উপহার পেল স্থানীয় শিল্পীর আঁকা হিমালয়ের একখানা ছবি। কিষানলাল নাকি রোয়েরিখ মেমোরিয়াল ট্রাস্টে আবেদনও রেখেছেন, নিকোলাসের পেন্টিং উদ্ধারের জন্য যেন একটা সম্মানজনক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় মিতিনকে। থার্ড আইয়ের কার্ডও রেখে দিলেন কিষানলাল। আর আশুতোষ শাহ উদ্যোগ নিয়েছেন মিতিনকে একটা সংবর্ধনা জানানোর। হিমাচল প্রদেশ সরকারের তরফ থেকে। সম্ভবত ফেরার সময়ে টুপুরদের আর একবার থামতে হবে কুলুতে।

সে যাই হোক, সকলেরই মন আজ খুশিতে ঝলমল। পথের কষ্ট কেউ গায়েই মাখছেন না। সহেলি পর্যন্ত ঠাট্টা-ইয়ার্কি জুড়েছেন অবনীর সঙ্গে। বুমবুমও আজ মোবাইল গেমে মত্ত নয়। হিমালয়ের এমন অমোঘ টান, সেও মোহিত হয়ে দেখছে পাহাড়-পর্বত।

পার্থ নিজের জায়গায়। সামনের সিটে। ঝাঁকুনি খেতে-খেতে একটু আগে গান ধরেছিল, আকাশভরা সূর্যতারা। তার বেসুরো গলা শুনে টিঙ্কুও হেসে খুন। সঙ্গীত ছেড়ে পার্থ এবার মজায় মেতেছে। হঠাৎই টুপুরকে বলল, "তোর মাসির কিন্তু হেভি ক্যালি। হিমালয়ে এসেও একটা কেস জুটিয়ে ফেলল তো!"

টুপুর বলল, "মেন ক্রেডিটটা কিন্তু বুমবুমের। ভাগ্যিস ও পেনড্রাইভখানা পেয়েছিল!"

"আরে, শুধু পেনড্রাইভেই হয়? ওই পেনড্রাইভ খেলিয়ে-খেলিয়ে কেমন একটা কেস বানিয়ে নিল। সেটা একবার ভাব। সাধে কী বলি, তোর মাসির মাথায় জিলিপির প্যাঁচ!"

টুপুর হি হি হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, "একটা প্রশ্ন কিন্তু তোমায় করা হয়নি মাসি।"

মিতিন স্মিত মুখে বলল, "কী রে?"

"ওই জোয়ান্নি সাহেব তোমার সন্দেহের তালিকায় ঢুকলেন কীভাবে? বিভব শর্মার কটেজে আসছেন শুনেই কি...?"

"ঠিক তা নয় রে। নামটা মাথায় রয়ে গিয়েছিল। আর্ট গ্যালারির রেজিস্টারে পেশাদার ফোটোগ্রাফারদের তালিকায় ওই নাম চোখে পড়তে সন্দেহটা দানা বাঁধে। তারপর যেই শুনলাম, তারকুণ্ডেদের ঘরভাড়া ক্রেডিট কার্ডে মেটানো হয়েছে, তখনই বুঝলাম, অন্য কেউ টাকা পাঠিয়েছে। কারণ, অত টাকা দেওয়া তারকুণ্ডেদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত তাদের স্টেটাস তাই বলে। পরে তো বিভব শর্মার কাছ থেকে বিল নিয়ে দেখাও গেল, ওদের আর রবার্তো জোয়ান্নির ক্রেডিট কার্ডের নম্বর এক।"

"হ্যাঁ। মিস্টার শাহ তো দু'খানা স্লিপই সিজ করলেন।"

"তারকুণ্ডে-ভাটিয়ার সঙ্গে রবার্তোর যোগাযোগের ওটাই তো মোক্ষম প্রমাণ রে।"

আলোচনার মাঝে সহেলি ধমকে উঠেছেন, "অ্যাই, তোরা কেসের গপ্পো থামাবি? এমন সুন্দর প্রকৃতির মাঝে চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে বকর-বকর ভাল লাগে?"

হক কথা। টুপুর থেমে গেল। হেঁচকি তুলে টুপুরদের গাড়িও থেমেছে। রোটাং পাসের মাথায়।

গাড়ি থেকে নামল টুপুর। সঙ্গে-সঙ্গে কনকনে হাওয়ার প্রবল ঝাপটা। গিরিপথ বেয়ে কী জোর বাতাস বইছে রে বাবা! ঝটিতি কুলু-টুপিতে টুপুর ঢেকেছে কান-মাথা। গলা পর্যন্ত টেনে দিল ফুলহাতা পশম জ্যাকেটের জিপার। তবু যেন বাধা মানছে না, হাড়ে গিয়ে বিঁধছে হিমকণা।

টুপুর কোনওক্রমে স্থিত করল নিজেকে। অমনি চোখ জুড়ে এক অনবদ্য দৃশ্য। দু' সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কত দূর যে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে গিরিপথ! ওই পথ দিয়েই বুঝি এক সময় বাণিজ্যে যেত বণিকের দল! ওই রাস্তা দিয়েই কত যে মানুষ প্রথম পা রেখেছে ভারতের মাটিতে!

ভাবতে গিয়ে দুম করে নিকোলাস রোয়েরিখকে মনে পড়ল টুপুরের। নিকোলাস সাহেব এই সব রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। পায়ে হেঁটে। পাহাড়কে ভালবেসে রয়ে গিয়েছিলেন এই দেশে। আর এই হিমালয়কেই তিনি এঁকে গিয়েছেন জীবনভর।
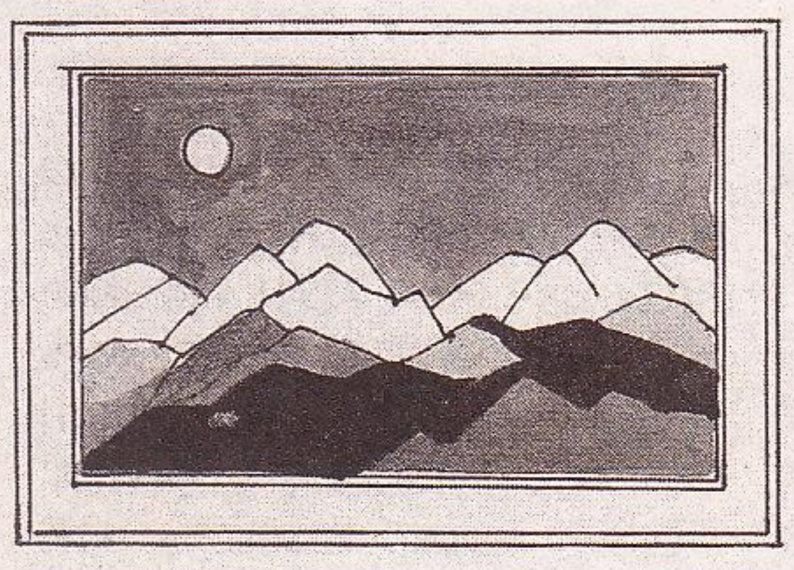
হায় রে, কেন যে রবার্তো জোয়ান্নিরাও আসে এই দেশে!